কবীরা গোনাহ্ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয়ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, অযু, নামায প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহ্র কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হলো সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুত সগীরা গোনাহ্ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোন লোক কবীরা গোনাহে লিপ্ত থেকেও অযু নামায আদায় করতে থাকে, তবে শুধুমাত্র অযু-নামায কিংবা অন্যান্য সৎকর্ম দ্বারা তার সগীরা গোনাহ্র কাফ্ফারাও হবে না---কবীরা গোনাহ্ তো থাকলই। ---কাজেই কবীরা গোনাহ্র একটা বিরাট অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধানবাণী বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সত্যিকার তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না। তাছাড়া এর ফলে অন্য আরও বহু লাঞ্ছনাও তার জন্য বর্তমান রয়েছে। যেমন, সেগুলোর কারণে তার গোনাহ মাফও হবে না এবং হাশরের মাঠে সে লোক কবীরা ও সগীরা উভয় প্রকার ছোট-বড় গোনাহ্র বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে; অথচ অন্য কেউই তার সে বোঝা লাঘব করতে পারবে না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহ্ঃ আয়াতে كبائر (কাবায়ির; কবীরার বহুবচন) শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং কবীরা গোনাহ্ কাকে বলে এবং তা মোট কত প্রকার তা বুঝে নেওয়া উচিত। এতদসঙ্গে সগীরা গোনাহ্ কি এবং তা কত প্রকার, এটাও জেনে নেওয়া দরকার।

উম্মতের উলামা সম্প্রদায় এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

কবীরা ও সগীরা গোনাহ্র সংজ্ঞা নিরূপণের পূর্বে একথা বিশদভাবে জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয় যে, 'গোনাহ্' বলতে সেসব কাজকে বোঝায় যা আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ। এতে পাঠকবর্গ হয়তো অনুমান করতে পারবেন যে, পরিভাষাগতভাবে যাকে সগীরা গোনাহ্ বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও ছোট নয়। যে কোন অবস্থায়ই আল্লাহ্র নাফরমানী এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যন্ত কঠিন অপরাধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইমামুল-হারামাইন ও অন্যান্য উলামা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেকটি নাফরমানী এবং তাঁর ইচ্ছার যে কোন রকম বিরুদ্ধাচরণই কবীরা ও কঠিনতর পাপ। তবে কবীরা ও সগীরার যে পার্থক্য, তা শুধুমাত্র তুলনামূলক। এ অর্থেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছেঃ كل ما نهى عنه فهو كبيرة অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সে সমস্তই গোনাহে-কবীরা।

সারকথা, যে গোনাহ্কে পরিভাষাগতভাবে সগীরা বা ছোট গোনাহ্ বলা হয়, কারও মতেই তার অর্থ এমন নয় যে, এসব গোনাহে লিপ্ততার ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে এবং এগুলোকে মামুলী মনে করে অবহেলা করা চলবে। বরং কোন সগীরা গোনাহ্ যদি নির্ভয়ে ও বেপরোয়াভাবে করা হয়, তবে সে সগীরাও কবীরা হয়ে যায়।

কোন এক বুযুর্গ বলেছেন---স্থূল দৃষ্টিতে ছোট গোনাহ্ ও বড় গোনাহ্র উদাহরণ,

যেন ছোট বিচ্ছু ও বড় বিচ্ছু ; কিংবা আগুনের বড় হল্কা ও ছোট অঙ্গার। এ দু'টির কোন একটির দহনও মানুষ সহ্য করতে পারে না। সে কারণেই মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুয্তী বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বড় ইবাদত হল গোনাহ্সমূহ বর্জন করা। যে সমস্ত লোক নামায ও তসবীহ্-তাহ্লীলের সাথে সাথে গোনাহ্ বর্জন করে না, তাদের ইবাদত কবুল হয় না। হযরত ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র) বলেছেন যে, তোমরা কোন গোনাহ্কে যতই হাল্কা বিবেচনা করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ততই বড় অপরাধে পরিণত হতে থাকবে। আর পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বলতেন যে, প্রতিটি গোনাহ্ই কুফরীর অগ্রদূত, যা মানুষকে কুফরীসুলভ কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের প্রতি আহবান করে থাকে।

মসনদে-আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) একবার হযরত মুআবিয়া (রা)-কে এক পত্রে লেখেন যে—বান্দা যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তখন তার প্রশংসাকারীরাও তার নিন্দা করতে আরম্ভ করে এবং মিত্ররাও তার শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। গোনাহ্র ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে পড়া মানুষের জন্য স্থায়ী বিনাশের কারণ।

বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "কোন ঈমানদার যখন কোন গোনাহ্ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু খচিত হয়ে যায়। পরে যদি সে তওবা করে নেয়, তাহলে সে বিন্দুটি মুছে যায়। কিন্তু যদি তওবা না করে সে বিন্দুটি বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার গোটা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।" কোরআনে এরই নাম বলা হয়েছে 'রাইন'। ইরশাদ হয়েছে ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ —অর্থাৎ তাদের অসৎ কর্ম তাদের অন্তরে মরচে ধরিয়ে দিয়েছে।"—অবশ্য গোনাহ্র দোষ, অশুভ পরিণতি ও অনিষ্টের প্রেক্ষিতে সেগুলোর মাঝে একটা পারস্পরিক পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। এই পার্থক্যের ভিত্তিতেই কোন গোনাহ্কে 'কবীরা' এবং কোনটিকে 'সগীরা' গোনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কবীরা গোনাহ্ঃ কোরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী উলামাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী গোনাহে-কবীরার সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ যে গোনাহের জন্য কোরআনুল-করীম কোন শরীয়তী শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে কিংবা যে পাপের জন্য লা'নতসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অথবা যে সবের কারণে জাহান্নাম প্রভৃতির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে সে সমস্তই 'গোনাহে-কবীরা'। তেমনিভাবে সে সমস্ত গোনাহ্ও গোনাহে-কবীরার অন্তর্ভুক্ত হবে, যার অনিষ্ট ও পরিণতি কোন কবীরা গোনাহের অনুরূপ কিংবা তার চাইতেও অধিক। যে সমস্ত সগীরা গোনাহ্ নির্ভয়ে করা হয় অথবা যা নিয়মিতভাবে করা হয়, সেগুলোও গোনাহে কবীরার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রা)-এর সামনে কোন এক ব্যক্তি গোনাহে-কবীরার সংখ্যা সাতটি বলে উল্লেখ করলে তিনি বললেন—'সাত নয়, সাত শ' বললেই ভালো হয়।

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (র) তাঁর 'আযাযাওয়াজির' গ্রন্থে সে সমস্ত গোনাহের

তালিকা ও প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী যেগুলো কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সে গ্রন্থে কবীরার সংখ্যা ৪৬৭ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অনেকে শুধু গোনাহের বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছেদগুলো গণনা করেছে, ফলে তাতে সংখ্যা কম লেখা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনেকে সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার প্রকারভেদগুলোও তুলে ধরেছেন। ফলে সংখ্যার দিক দিয়ে তা অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই প্রকৃত পক্ষে এতে কোন বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই।

রসূলে করীম (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে কবীরা গোনাহ্ বলে অভিহিত করেছেন। পরিস্থিতি অনুপাতে কোথাও তিন, কোথাও সাত এবং কোথাও এর চাইতে বেশী সংখ্যক কাজকে কবীরা গোনাহ্ বলে অভিহিত করেছেন। এ সব বর্ণনা থেকেই আলিমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কবীরা গোনাহের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুপাতে যেখানে যেসব বিষয় কবীরা গোনাহ বলে মনে হয়েছে, সেগুলোর কথাই বলে দেওয়া হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কবীরা গোনাহ্গুলোর মধ্যেও যে কয়টি সবচাইতে বড় সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ গোনাহগুলোর সংখ্যা তিনটি। যথা, কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা বা তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা।

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্ কোন্টি? জবাবে তিনি বললেন—আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা; অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর সব চাইতে বড় গোনাহ্ কি? বললেন, তোমার খোরাকের মধ্যে এসে ভাগ বসাবে, কিংবা এদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিতে হবে, এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা।

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এরপর সবচাইতে বড় গোনাহ্ কোন্টি? জবাব দিলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। ব্যভিচার এমনিতেই জঘন্য অপরাধ, তদুপরি নিজের পরিবার-পরিজনের ন্যায় পড়শীর ইজ্জত-আবরুর হিফাযত করাও যেহেতু তোমার একটা নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব এজন্য পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের গোনাহ্ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ নিজের পিতা-মাতাকে গাল দেওয়া কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! এটা কি করে হতে পারে যে, কেউ তার পিতা-মাতাকে গাল দেবে! বললেন, কেন হবে না? কেউ যখন অন্যের পিতা-মাতাকে গাল দেয় এবং সে যখন এর প্রতিউত্তর দিতে থাকে, তখন তার নিজের পিতা-মাতার প্রতি বর্ষিত গাল যেহেতু তার প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া, সেহেতু প্রকারান্তরে সে নিজেই তো তার পিতা-মাতাকে গাল দিলো।

বুখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শিরক করা, অকারণে

কাউকে হত্যা করা, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের অসম্মান করাকে কবীরা গোনাহ্ বলে অভিহিত করেছেন।

হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে কুফরিস্তান থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে আসার পর পুনরায় কুফরিস্তানে ফিরে যাওয়াকেও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথা, মিথ্যা কসম খাওয়া, অন্যদের প্রয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকে রাখা, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা এবং যাদুর আমল করা। কোন কোন বর্ণনায় উল্লিখিত রয়েছে যে,—সমস্ত কবীরা গোনাহ্র বড় গোনাহ্ হচ্ছে 'মদ্য পান।' কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যাবতীয় অশ্লীলতার মূল উৎস হচ্ছে শরাব। কেননা, শরাব পান করে মাতাল হওয়ার পর মানুষ যে কোন মন্দ কর্ম অবাধে করে ফেলতে পারে।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গোনাহ্ হচ্ছে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করা, যদ্দ্বারা তার ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট হতে পারে।

অনুরূপ আর এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত কোন ওজর ছাড়াই দু'ওয়াক্তের নামায একত্র করে ফেলে, সে কবীরা গোনায় পতিত হয়। অর্থাৎ কোন ওয়াক্তের নামায সে ওয়াক্তের মধ্যে আদায় না করে পরের ওয়াক্তে কাযা পড়াও কবীরা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গোনাহ্। তেমনি, আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও কবীরা গোনাহ্।

এক রেওয়ায়েতে আছে যে, কোন ওয়ারিসকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কিংবা তার অংশ কমানোর উদ্দেশ্যে কোন ওসিয়্যত করাও কবীরা গোনাহর অন্তর্গত।

সহীহ্ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা রসূলে করীম (সা) বলতে লাগলেন, এরা ভাগ্যহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে ; কথাটা তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন। সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক কারা, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)? রসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দিলেন, "প্রথমত সেই ব্যক্তি যে পাজামা, লুঙ্গি অথবা কুর্তা অহঙ্কারভরে পায়ের গিরার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে তার অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ হওয়ার পরও ব্যভিচার করে, চতুর্থত ঐ ব্যক্তি যে শাসক কিংবা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও মিথ্যা বলে, পঞ্চম ঐ ব্যক্তি যে সন্তান-সন্ততির জনক হওয়ার পরও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়, ষষ্ঠত ঐ ব্যক্তি যে কেবল মাত্র পার্থিব কোন স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কোন ইমামের হাতে বায়'আত করে।"

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। নাসায়ী, মসনদে-আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যথা—শরাবী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়-স্বজনের সাথে

অকারণে সম্পর্ক ছিন্নকারী, কারো প্রতি অনুগ্রহ করে সে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে যে কথা শোনায়, জিন্নাত, শয়তান কিংবা অনুরূপ অন্য কোন কিছুর আমলের মাধ্যমে যে ব্যক্তি গায়েবের খবর বলে, দাইয়ুস অর্থাৎ নিজের পরিবার-পরিজনকে যে ব্যক্তি বেহায়াপনা থেকে বাধা দান করে না।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উক্ত হয়েছে যে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর উদ্দেশে কোন জন্তু কোরবানী করে।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ
فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

(৩২) আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। (৩৩) পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়রা যা ত্যাগ করে যান, সে সবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি! আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কিত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি নারী ও পুরুষ উভয়ই থাকে এবং মৃতের সাথে যদি তাদের একই ধরনের সম্পর্ক থাকে, তবে পুরুষ নারীর তুলনায় দ্বিগুণ অংশ পাবে। নারীর তুলনায় পুরুষের এমনি ধরনের আরো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। একবার হযরত উম্মে-সালমা হুযুর (সা)-এর খেদমতে এ বিষয়টি উত্থাপন করে আরয করেছিলেন যে, আমাদের স্ত্রী জাতির জন্য ওয়ারিসী স্বত্বের অর্ধেক নির্ধারিত হয়েছে। এমন ধরনের আরো কিছু বৈষম্য নারীদের বেলায় কেন করা হলো? এখানে উদ্দেশ্য আপত্তি উত্থাপন নয়, বরং এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা যে, আমরাও যদি পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতাম, তবে আমরাও পুরুষদের ন্যায় সর্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পারতাম! কোন কোন স্ত্রীলোক এরূপ আক্ষেপও প্রকাশ করেছিলেন যে, হায়! আমরাও যদি পুরুষ হতাম, তবে জিহাদে অংশগ্রহণ করে ফযীলত লাভ করতে পারতাম।

জনৈক স্ত্রীলোক একবার রসূল (সা)-এর কাছে এ মর্মে প্রশ্নও করেছিলেন যে, আমরা নারীরা ওয়ারিসী স্বত্বের অর্ধেক পাই। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও দু'জন স্ত্রীলোকের সমান ধরা হয় একজন পুরুষকে। এমনিভাবে আমল-ইবাদতের ফলও কি আমরা অর্ধেক পাবো? এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই এ আয়াত দু'টি নাযিল হয়েছে। এতে ولا تتمنوا বলে হযরত উম্মে-সালমার প্রশ্নের এবং للرجال نصيب বলে অপর স্ত্রীলোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তোমরা (সকল পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ের) আকাঙ্ক্ষা করো না যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এক শ্রেণীকে (পুরুষকে) অন্য শ্রেণীর উপর (স্ত্রীলোকদের উপর তাদের কোন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই) প্রাধান্য দান করেছেন। (যেমন, পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করা, পুরুষদের জন্য দ্বিগুণ হিস্সা নির্ধারিত হওয়া, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দু'জন স্ত্রীলোকের সমান গণ্য হওয়া ইত্যাদি)। পুরুষদের জন্য তাদের আমলের (সওয়াব) অংশ (আখিরাতে) নির্ধারিত এবং স্ত্রীলোকদের জন্যও তাদের আমলের (সওয়াব) অংশ (আখিরাতে) নির্ধারিত রয়েছে। (আর নিয়মানুযায়ী এ আমলের উপরই পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল। আমলের ক্ষেত্রে কারো কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সুতরাং একের উপর যদি অন্যের প্রাধান্য লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমলের ক্ষেত্রে সে প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টা কর। কেননা, এটা সবারই সাধ্যায়ত্ত। এছাড়া যেসব বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেগুলোর আকাঙ্ক্ষা করা নিছক অর্থহীন লালসা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে যদি এমন কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ হয়, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত যেমন, আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন, তবে তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য এ আকাঙ্ক্ষার পন্থাও এই নয় যে, শুধু মৌখিক আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতে থাকবে, বরং) আল্লাহ্র কাছে তাঁর (বিশেষ) অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই উত্তমরূপে জ্ঞাত রয়েছেন। (এতে আল্লাহ্-প্রদত্ত কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদানের তাৎপর্য এবং মানুষের সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লাভ করার জন্য দোয়া করার বৈধতাও বর্ণনা করা হলো) আর প্রত্যেক এমন সম্পদের জন্য যা পিতামাতা এবং (অন্যান্য) আত্মীয়-স্বজন (মৃত্যুর পর) ছেড়ে যায়, আমি ওয়ারিস নির্ধারিত করে দিয়েছি। আর যেসব লোকের সাথে (পূর্ব থেকেই) তোমাদের চুক্তি করা আছে, তাদেরকে তাদের হিস্সা দিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে অবহিত। (চুক্তিবদ্ধ লোক, যাদের 'মাওয়ালাত' বলা হতো তাদের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে এ হিস্সা কে দেয় এবং কে দেয় না, সে সব কিছুর খবর তিনি অবশ্যই রাখেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা ঃ এ আয়াতে অন্যের এমন-সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত

নয়। কারণ, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-বুদ্ধি বা শারীরিক সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে হীন বলে মনে করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অন্তরে হিংসার বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এতে কম করে হলেও তার মনে সেই সব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোকের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মত নয়। কেননা, তা অর্জন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বা কোন সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের সেরা কোন পরিবারের সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কারো পক্ষে অত্যন্ত সুশ্রী হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে তবে সারা জীবন সাধ্যসাধনা করেও তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণত কোন বেঁটে কদাকার লোক সুন্দর-সুঠাম হওয়ার জন্য কিংবা কোন সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, কোন দাওয়া তদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অন্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, আমার পক্ষে যখন এরূপটি হওয়া সম্ভব নয়, তখন অন্য আর একজন কেন এরূপ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত হবে? এরূপ মনোভাবকে 'হাসাদ' বা হিংসা বলা হয়। এটা মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগ বিশেষ। দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া-ফসাদ এবং হত্যা-লুণ্ঠনের উদগাতাই হচ্ছে মানব-চরিত্রের এ কুৎসিত ব্যাধি।

কোরআন-করীম সেই অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই ইরশাদ করেছে ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন হিকমতের কারণেই মানুষের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করেছেন। তাঁর কল্যাণ-হস্তই এক-একজনের মধ্যে এক-এক ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিতরণ করেছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই তার আপন ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অন্যের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর বিষিয়ে তোলা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা, এতে নিজেকে অর্থহীন মানসিক পীড়া এবং হিংসারূপী কঠিন গোনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শুকুরগুযারী করা কর্তব্য। অপর পক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে সন্তুষ্ট থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হতো, তবে হয়তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো না বরং উল্টা গোনাহ্‌গার হতে হতো। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নিয়ামতের শুকরিয়া করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয়তো কোন মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ্ পাক আমাকে এই চেহারা বা অবয়ব দিয়ে

সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি সুশ্রী হতাম, তবে হয়তো কোন ফেতনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেই যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোন লোকের পক্ষেও রক্ত-ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা, হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। তাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও সদগুণের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ করতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে ছাড়িয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে।

কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক সহীহ্ হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা) শুধু ঐ সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত. যেগুলো চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তাঁর কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। আলোচ্য এ আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

অর্থাৎ পুরুষরা যা কিছু-সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে।

আয়াতের মর্ম দ্বারা আরো জানা গেল যে, কারো জ্ঞান-গরিমা এবং চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য দেখে সেরূপ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসনীয় কাজ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বহুল প্রচলিত একটা ভুল ধারণার অপনোদন হয়ে যায়, যদ্দ্বারা সচরাচর অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। যেমন, চেষ্টা-তদবিরের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না, অন্যের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অনেকেই জীবনের শান্তি স্বস্তি বিসর্জন দিয়ে বসেন, এমন কি যদি সে আকাঙ্ক্ষা হাসাদ-এর পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, তবে এর দ্বারা আখিরাতও বিনষ্ট করে দেন। কেননা, হাসাদ এমন একটা কঠিন গোনাহ্ যদ্দ্বারা মানুষের আখিরাত অতি সহজেই বরবাদ হয়ে যায়।

অপরপক্ষে অনেকেই কর্ম-বিমুখতা ও উদ্যমহীনতার কারণে সেগুলো অর্জন করার জন্যও উদ্যোগী হয় না, যেসব বৈশিষ্ট্য মানুষের চেষ্টা সাধনার দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, নিজেদের আলস্য ও অকর্মণ্যতাকে আড়াল করে রাখার জন্য, তকদীরকে দায়ী করে।

মানুষের এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব বিষয় মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, বরং নিছক আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যেমন কারো পক্ষে সুঠাম তনুশ্রীর অধিকারী হওয়া কিংবা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তকদীরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র শুকুর করা কর্তব্য। যতটুকু সে লাভ করেছে এর বেশী আকাঙ্ক্ষা করা এ ক্ষেত্রে শুধু অর্থহীনই নয়, সীমাহীন মানসিক যাতনা ডেকে আনার নামান্তর মাত্র।

অপরদিকে মানুষ স্বীয় সাধনাবলে যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, সেগুলোর জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উপকারী। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে তা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা ও সাধনাও থাকতে হবে। আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন চেষ্টাকারীর চেষ্টাই বৃথা যাবে না, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককেই তার চেষ্টা ও সাধনা অনুপাতে ফল দেওয়া হবে।

তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের পূর্বে لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ এবং وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ -এর নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করতে কিংবা কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতে সে দু'টি অপরাধের উৎস মুখ বন্ধ করার লক্ষ্যেই তাকীদ করা হয়েছে যে, অন্য লোকদেরকে যে ধন-সম্পদ কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অথবা মান-সম্ভ্রম প্রভৃতিতে তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্ প্রদত্ত যে বৈশিষ্ট্য বা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তোমরা সেসবের আকাঙ্ক্ষাও করো না। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, চুরি-ডাকাতি, হত্যা-লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধের মূল উৎসই হচ্ছে অপরের সুখ-ও সমৃদ্ধির প্রতি অন্যায় লোভ ও লালসা। সে লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই মানুষ এসব অন্যায়ের পথে ধাবিত হয়। কোরআন এসব অনাচারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অন্যের সুখ ও সৌভাগ্যের প্রতি অন্যায় লালসার উৎসমুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছেঃ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ --এতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অন্যকে তোমাদের চাইতে যে কোন বিষয়ে সমৃদ্ধ দেখতে পাও, তবে তার সেটুকুই লাভ করার অর্থহীন আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে তুমি নিজের জন্যই আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে থাক। কেননা, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যেকের

ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে বর্ষিত হয়ে থাকে। কারো প্রতি এ অনুগ্রহ ধন-সম্পদের আকারে দেখা দেয়! কেননা সে ব্যক্তি যদি সম্পদহীন হতো, তবে হয়ত কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়তো! আবার কারো পক্ষে হয়ত দারিদ্র্যই আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, যদি তার হাতে অর্থ-সম্পদ আসতো, তবে হয়ত সে হাজার রকমের গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়তো।

এ জন্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কাছে যখন চাও, তখন বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। যেন তিনি তাঁর হিকমত অনুপাতে তোমার পক্ষে যা কল্যাণকর, সেরূপ অনুগ্রহের দ্বারই তোমার জন্য খুলে দেন।

আয়াতের শানে নযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে, ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন কোন স্ত্রীলোক এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন যে, আমরা যদি নারী না হয়ে পুরুষ হয়ে জন্মাতাম, তবে দ্বিগুণ স্বত্বের অধিকারী হতে পারতাম। সে দিকে লক্ষ্য করেই ওয়ারিসী স্বত্বের বিষয়টিও এখানে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ আকাঙ্ক্ষার জবাব হয়ে যায়। বলা হয়েছে যে, অংশীদারদের যার জন্য যে হিস্‌সা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বিশেষ হিকমতের মাধ্যমে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতেই করা হয়েছে। মানুষের স্থূল বুদ্ধি যেহেতু সব ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা রাখে না, সেজন্যই এ অংশ নির্ধারণের গূঢ় তাৎপর্য হয়ত সে সহজে বুঝে উঠতে পারে না। সে মতে যার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ্‌র শুকুর করা কর্তব্য।

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির অংশ ঃ আয়াতের শেষে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির যে অংশের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে দু'ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের চুক্তি হতো। এ চুক্তি অনুযায়ী একে অপরের ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশীদার হতো। কিন্তু পরবর্তীতে وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ শীর্ষক আয়াত নাযিল হয়ে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির অংশ প্রদানের নির্দেশ রহিত করে দিয়েছে। ফলে যে ব্যক্তির কোরআন নির্দেশিত ওয়ারিস রয়েছে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির কোন অংশ নেই।

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۭ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا
حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا

يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

(৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকেরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হিফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হিফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। (৩৫) যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে নারীদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে তাদের অধিকার বিনষ্ট করা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাও ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে পুরুষদের হক বর্ণনা করা হচ্ছে। এতদসঙ্গে পুরুষ কর্তৃক সে অধিকার আদায়, প্রয়োজনে শাসন এবং কোন মারাত্মক বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার পন্থাও উল্লিখিত হয়েছে। আনুষঙ্গিকভাবে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় এক স্তর ঊর্ধ্বে। সুতরাং পরোক্ষভাবে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ স্তরভেদের কারণেই পুরুষের জন্য নারীর দ্বিগুণ ওয়ারিসী স্বত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পুরুষ শ্রেণী অভিভাবক স্ত্রী শ্রেণীর ওপর (দু'টি কারণে প্রথমত) এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে কাউকে (অর্থাৎ পুরুষ শ্রেণীকে) কারো কারো উপর (অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের উপর স্বভাবগত) প্রাধান্য দান করেছেন এবং (দ্বিতীয়ত) এজন্য যে, পুরুষরা (স্ত্রীলোকের জন্য) স্বীয় সম্পদ (মোহর ও ভরণ-পোষণ বাবদ) ব্যয় করে থাকে (স্বভাবতই যারা খরচ করে, তাদের মর্যাদা উপরে থাকে)। সুতরাং যেসব স্ত্রীলোক সতী-সাধ্বী (তারা পুরুষের প্রকৃতিগত প্রাধান্য ও অধিকারের কারণে) অনুগতা হয়ে থাকে (এবং) পুরুষদের চোখের আড়ালেও আল্লাহ্র (তওফীক অনুযায়ী) হিফাযত করে থাকে পুরুষের ইজ্জত-আবরু ও ধন-সম্পদ। আর যেসব স্ত্রীলোক (এরূপ গুণসম্পন্না হয় না, বরং) এমন হয় যে, তোমরা (বিভিন্ন আচরণের দ্বারা) তাদের উগ্রতা অনুভব কর, তাদেরকে (প্রথমে) উপ-দেশের মাধ্যমে বোঝাও। (কিন্তু) যদি (তাতে) না মানে, তবে বিছানায় একা থাকতে দাও (অর্থাৎ তাদের সাথে একত্রে শয়ন করা ত্যাগ কর)। বস্তুত (এতেও যদি পথে না আসে, তবে) তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এতেই যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তবে তাদের (উপর অধিক বাড়াবাড়ি করার) জন্য উসিলা (এবং মওকা) তালাশ করো না।

(কেননা) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সুমহান এবং সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। (তাঁর শক্তি, জ্ঞান এবং অধিকারের সীমা অনেক প্রশস্ত। তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর, তবে তিনিও তোমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার হাজার ধরনের পথ বের করতে পারবেন।) এবং যদি (অবস্থা-দৃষ্টে) তোমরা এ দম্পতির মধ্যে (এমন বিবাদ-বিসংবাদের) আশংকাই কর (যা তারা নিজেরা নিষ্পত্তি করতে পারবে না বলে মনে হয়), তবে তোমরা নিষ্পত্তি করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন একজন স্বামীর পরিবার থেকে এবং একজন (অনুরূপ) নিষ্পত্তি করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক স্ত্রীর পরিবার থেকে (নির্বাচন করে তাদের মধ্যকার তিক্ততা দূর করার দায়িত্ব দিয়ে) প্রেরণ কর (যাতে তারা গিয়ে উভয়ের মধ্যকার তিক্ততার কারণ যাচাই করে এবং যার দোষ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে)। যদি এ দু'ব্যক্তি (নিষ্ঠার সাথে) নিষ্পত্তির চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই দম্পতির মধ্যে নিষ্পত্তির পথ খুলে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ এবং সবকিছু অবহিত। (কোন্ পথে এদের মধ্যকার তিক্ততা দূর হবে, তা তিনি জানেন। সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি ঠিক থাকে, তবে কিভাবে এদের মধ্যে নিষ্পত্তি হবে, তা তিনিই তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা নিসার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল নারী শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র অবলা নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্যাতনমূলক অন্যায় আচরণ প্রচলিত ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কোরআন সেগুলোর উচ্ছেদ সাধন করেছে। বস্তুত পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও সেরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। নারীদের জিম্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরয করেছে।

সূরা বাকারার এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ০

অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের অধিকার পুরুষের উপর ততটুকুই ওয়াজিব, যতটুকু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অধিকার। এখানে উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান বলে ঘোষণা করে তার বাস্তবায়নের নিয়ম-পদ্ধতি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। এতে জাহিলিয়াতের যুগ থেকে নারীদের ব্যাপারে যেসব অমানবিক আচরণ করা হতো সেসবের উৎখাত করা হয়েছে। অবশ্য এটা জরুরী নয় যে, অধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিও একই ধরনের হবে। নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধরন অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু অধিকারের সীমা সংকুচিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। নারীর প্রতি যেমন গৃহের কর্তৃত্ব, সন্তানের লালন-পালন প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি পুরুষের প্রতি নারীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জীবিকার্জনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, অনুরূপ নারীদের প্রতি যেমন পুরুষের সেবা ও আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তেমনি পুরুষের

উপরও তাদের মোহর ও খোরপোশের দায়িত্ব ফরয করা হয়েছে। মোটকথা, এ আয়াতে নারী এবং পুরুষের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য নারী জাতির উপর পুরুষের স্বভাবগত প্রাধান্যও দেওয়া হয়েছে। যার বর্ণনা আয়াতের শেষে এই বলে বর্ণিত হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ স্ত্রীজাতির উপর পুরুষদের এক স্তর প্রাধান্য রয়েছে।

আয়াতে এ প্রাধান্যের বিষয়টিও বিশেষ প্রজ্ঞার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্ত্রী-লোকের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেই তা করা হয়েছে; নারী জাতিকে খাটো করা কিংবা তাদের কোন অধিকারের সীমা সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।

বলা হয়েছে ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আরবী ভাষায় قَيَّامٌ-قَوَّامٌ এবং قَيِّمٌ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কোন কাজ কিংবা বিধানের পরিচালক অথবা দায়িত্বশীল। এ কারণেই আয়াতের তরজমা করা হয় যে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের পরিচালক বা অভিভাবক। এর অর্থ, সাধারণত যে কোন যৌথ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যেমন একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী; রাষ্ট্র, সমাজ বা কোন গোত্র পরি-চালনার জন্য যেমন একজন প্রধান ব্যক্তি থাকা অপরিহার্য, তেমনি পরিবার পরিচালনার জন্যও একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী। পরিবার পরিচালনার সে দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক শিশু বা স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ না করে পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন। কেননা সংসার জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্ত্রীলোক ও শিশুদের চাইতে পুরুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা যে অধিক, এ সত্য বিষয়টি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোন সুস্থ বুদ্ধির লোকই অস্বীকার করতে পারে না।

মোট কথা, সূরা বাকারার وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ আয়াতে এবং সূরা নিসার اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও নারীদের অধিকার পুরুষের উপর ততটুকু যতটুকু নারীদের উপর পুরুষের অধিকার এবং উভয়ের অধিকার একই পর্যায়ের, তবুও একটি বিষয়ে নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, পুরুষ নারীদের অভিভাবক। তবে কোরআনের অন্য আয়াতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ অভিভাবকত্ব স্বৈরাচারমূলকভাবে প্রয়োগ করার অধিকার পুরুষের নেই; বরং এ অভিভাবকত্বও শরীয়তের বিধি-বিধান এবং

পারস্পরিক পরামর্শের নীতিমালার অধীন। সে তার খেয়াল-খুশী মত যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। বরং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ "স্ত্রীদের সাথে সমীচীন পন্থায় উত্তম আচরণের সাথে জীবন যাপন কর।

অনুরূপ অন্য এক আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গৃহস্থালী তথা সংসার-যাত্রার ব্যাপারে স্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কর। সুতরাং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্ত্রীদের পক্ষে কোন প্রকার ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও যেহেতু নারীদের অধীনতার গ্লানি বা এ ধরনের কোন প্রতিকূল অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এখানে শুধু নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি বরং এ প্রাধান্যের হিকমত এবং তাৎপর্যও সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, দু'কারণে এ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ; একটি হচ্ছে জন্মগত-ভাবে আল্লাহ্র দান, যাতে মানুষের চেষ্টা সাধনার কোন হাত নেই আর অপরটি হচ্ছে কর্ম ও দায়িত্বপ্রসূত।

প্রথম কারণটি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ হিকমত ও মঙ্গল চিন্তার কারণেই একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন, কাউকে উত্তম এবং কাউকে অনুত্তম করেছেন। যেমন একটা বিশেষ ঘরকে 'বায়তুল্লাহ্' এবং নিখিল বিশ্বের কেবলায় পরিণত করে দিয়েছেন, বায়তুল-মোকাদ্দাসকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তেমনি নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যও আল্লাহ্ তা'আলার একটা বিশেষ বিধান ও অনুগ্রহ। এতে পুরুষ জাতির শ্রমের সাধনা কিংবা স্ত্রী জাতির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন প্রভাব নেই।

দ্বিতীয় কারণ অবশ্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত আমল। যেমন, পুরুষ নারীদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, তাদের মোহর প্রদান এবং ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্বভার বহন করে। এ দু'কারণেই পুরুষকে নারীদের উপর অভিভাবক করা হয়েছে।

এ আয়াতে আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ইবনে হাব্বান বাহ্রে মুহীতে লিখেছেন, নারীদের উপর পুরুষের অভিভাবকত্বের যে দু'টি কারণ কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, তদ্দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কারো পক্ষে শুধু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হওয়ার অধিকার নেই। বরং কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতার দ্বারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার বৈধতা জন্মে।

কোরআনের অনন্য বর্ণনাভঙ্গি ঃ নারীর উপর পুরুষের এ প্রাধান্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন যে অনন্য বর্ণনাশৈলীর আশ্রয় নিয়েছে, তাও প্রণিধানযোগ্য। এখানে সোজাসুজি 'স্ত্রীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে'—একথা না বলে "তোমাদের কারো কারো উপর কারো কারো প্রাধান্য রয়েছে" বলা হয়েছে। এরূপ বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বনের তাৎপর্য হলো,

এতে নারী ও পুরুষদেরকে 'পরস্পরের অংশ' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন কোন বিষয়ে পুরুষরা নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেও মানুষের মাথা যেমন তার হাতের তুলনায় কিংবা হৃৎপিণ্ড পাকস্থলীর তুলনায় উত্তম, পুরুষও নারীর তুলনায় তদনুরূপই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হাতের তুলনায় মস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন হাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে খর্ব করে না, তেমনি নারীর তুলনায় পুরুষের এ শ্রেষ্ঠত্বও নারীর মর্যাদাকে খর্ব করে না। কেননা, উভয়েই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায়। পুরুষকে যদি দেহের মাথা ধরা হয়, তবে স্ত্রী তার শরীর বিশেষ।

কোন কোন তফসীরকারের মতে নারীর উপর পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ শ্রেণীগত দিক দিয়ে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বটে, কিন্তু ব্যক্তি বিচারে জ্ঞান, মেধা, আমল ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে অনেক স্ত্রীলোকও অনেক পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে পারে।

নারী-পুরুষের কর্মবিভাগ ঃ বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় যে কারণটি বলা হয়েছে, তা মানুষের আয়ত্তাধীন। তা হচ্ছে, যেহেতু পুরুষ নারীদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত।

এতেও আনুষঙ্গিকভাবে কয়েকটি সন্দেহের অপনোদন হয়। যেমন মীরাসের আয়াতে পুরুষদের জন্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারতো, পরোক্ষভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পূর্ণতই পুরুষের কাঁধে অর্পিত। বিয়ের পর স্বামীর উপরই নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বর্তায়। সেমতে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পুরুষের জন্য মীরাসের যে দ্বিগুণ অংশ নির্ধারিত হয়েছে, তা কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কারণ, পরোক্ষভাবে তা আবার নারীদের কাছেই ফিরে আসে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে, প্রকৃতিগতভাবে স্ত্রীলোকেরা যেহেতু রুজিরোজগারের ক্ষেত্রে শ্রম নিয়োগ করার যোগ্যতা রাখে না এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছোটাছুটি করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, সেজন্য তাদেরকে পুরুষের ন্যায় মাঠে-ময়দানে বা দপ্তরে-বাজারে ছোটাছুটির দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে ঘরের দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা-বিধানের যিম্মা দেওয়া হয়েছে। বিশেষত যেহেতু সন্তান প্রসব এবং তাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র নারীরাই দায়িত্বপ্রাপ্তা, পুরুষরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অকেজো সেমতে পুরুষদের জীবিকার্জনে শ্রম নিয়োগ এবং নারীদের বংশবৃদ্ধি এবং শিশুদের যোগ্য লালন-পালন ও শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রম-বিভাজন করা হয়েছে।

অবশ্য এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, নারীদের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে পুরুষের মুখাপেক্ষী করে তাদের মর্যাদা খাটো করা হয়েছে। বরং কর্ম ও দায়িত্ব বিভাজন করে দিয়ে প্রত্যেককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও মর্যাদার অধিকারী করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ কর্মবিভাগের মধ্যে প্রত্যেকেরই দায়িত্বের সাথে সাথে পারস্পরিক যে বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে এসে যায়, এখানেও তা হওয়া স্বাভাবিক।

মোট কথা, দু'টি কারণে নারীর উপর পুরুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যমন পুরুষের তুলনায় নারীদের মর্যাদা হানি করা হয়নি, তেমনি তাদের জীবন-মানকেও খাটো করা হয়নি। বরং সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে উপকারিতার দিক দিয়ে এ নির্দেশের ফল নারী জাতির পক্ষেই অধিকতর কার্যকরী প্রতীয়মান হবে।

নেককার স্ত্রী ঃ এ আয়াতের শুরুতে মূলনীতি হিসাবে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষরা স্ত্রীলোকদের উপর অভিভাবকস্বরূপ। অতঃপর নেক ও বদ স্ত্রীলোকদের কথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

অর্থাৎ "তারাই নেককার স্ত্রীলোক যারা পুরুষের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের আনুগত্য করতে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতেও নিজেদের ও ধন-সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতে থাকে।" অর্থাৎ স্বীয় সতীত্ব ও ঘরের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, যা গৃহকর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে পুরুষদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি উভয় অবস্থাই তাদের জন্য সমান। তাদের উপস্থিতিতে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করবে, আর অনু-পস্থিতিতে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, তা নয়।

রসূলে করীম (সা) এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ ইরশাদ করেছেন ঃ

خير النساء امراة اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسها -

অর্থাৎ "উত্তম স্ত্রীলোক সে-ই, যখন তাকে দেখবে পুলকিত হবে, যখন তাকে কোন নির্দেশ দেবে, তখন সে আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাকবে, তখন সে নিজের এবং তোমার ধন-সম্পদের হিফাযত করবে।"

আর যেহেতু স্ত্রীলোকদের এ সমস্ত দায়িত্ব অর্থাৎ নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের কোনটিই সহজ কাজ নয় সেজন্যই পরে বলে দেওয়া হয়েছে بما حفظ الله অর্থাৎ এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং স্ত্রীলোকদের সাহায্য করেন। তাঁরই সাহায্য ও সামর্থ্য দানের ফলে তারা এসব দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়। অন্যথায় রিপু ও শয়তানের প্রতারণা সর্বক্ষণই প্রতিটি মানুষ তথা নর-নারীকে পরিবেষ্টন করে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে এসব দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় বেশী দৃঢ় দেখা যায়। এ-সবই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সামর্থ্য দানের ফল। সে কারণেই অশ্লীলতাজনিত পাপে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা কম লিপ্ত হয়ে থাকে।

আনুগত্যপরায়ণা স্ত্রীলোকদের ফযীলত যেমন এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তেমনি এ ব্যাপারে বহু হাদীসও বর্ণিত রয়েছে।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অনুগত তার জন্য আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করে শূন্যে উড়ন্ত পাখিরা, সাগরের মাছেরা, আকাশের ফেরেশতাকুল এবং বনের জীব-জন্তুরা।---(বাহ্রে-মুহীত)

না-ফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় ঃ অতঃপর সেসব স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কোরআনে-করীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ -

অর্থাৎ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে, যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। কোরআন-করীমে এ প্রসঙ্গে فى المضاجع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফিকহ্ শাস্ত্রবিদরা এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পার্থক্য শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ী বা থাকার ঘর পৃথক করবে না---যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ, তাতে তার দুঃখও বেশী হবে এবং এতে কোন রকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও আশংকা অধিক।

কোন এক সাহাবী রেওয়ায়েত করেছেন ঃ

قلت يا رسول الله ما حقّ زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر الا فى البيت -

অর্থাৎ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিবেদন করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, তোমরা খেলে তাদেরও খাওয়াবে, তোমরা পরলে তাদেরও পরাবে। আর তাদের মুখমণ্ডলে মারবে না। তাদের থেকে যদি পৃথক থাকতে চাও, তবে শুধুমাত্র বিছানা পৃথক করে নেবে---ঘর পৃথক করবে না।

বস্তুত এই ভদ্রোজনোচিত শাসন ও শাস্তিতেও যদি কোন ফল না হয়, তবে তাকে সাধারণ মারধর করারও অনুমতি রয়েছে। তবে মুখমণ্ডলে মারতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শাস্তিগুলো যেহেতু একান্তই ভদ্রজনোচিত, তাই সে ব্যাপারে নবী-রসূল ও বুযুর্গ-মনীষীবৃন্দ তার মৌখিক অনুমতিও দান করেছেন এবং কার্যকরভাবেও তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় শাস্তি অর্থাৎ মারধর করার অনুমতি যদিও অপারকতার পর্যায়ে বিশেষ ভঙ্গিতে পুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাদীসে এ কথাও বলে দেওয়া

হয়েছে যে, وَلَنْ يَّضْرِبَ خِيَارُكُمْ যারা ভাল মানুষ তারা স্ত্রীদেরকে এ শাস্তি দেবে না। সুতরাং নবী-রসূলদের দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ নেই।

ইবনে সা'আদ ও বায়হাকী (র) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে স্ত্রীদের মারধর করার ব্যাপারে পুরুষদের সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে স্ত্রীরা উদ্ধত হয়ে পড়লে পুনরায় তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতটিও এমনি একটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। এর শানে-নযুল হচ্ছে এই যে, যায়েদ ইবনে যুবায়র (রা) তাঁর কন্যা হাবীবাহ্ (রা)-কে হযরত সা'দ ইবনে রাবী (রা)-র নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা বিরোধ দেখা দিলে স্বামী তাকে থাপ্পড় মেরে বসেন। তাতে হাবীবাহ্ (রা) তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করে। পিতা যুবায়র (রা) তাঁকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি নির্দেশ দেন যে, যতটা জোরে সা'দ ইবনে রাবী হাবীবাকে থাপ্পড় মেরেছে, তারও অধিকার রয়েছে তাকে ততটা জোরে থাপ্পড় মারার।

তাঁরা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর হুকুম শুনে সেমতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু তখনই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হল। এতে সর্বশেষ পর্যায়ে স্ত্রীকে মারধর করাও স্বামীর জন্য জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরুষদের বিরুদ্ধে কিসাস কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। যা হোক, আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা) তাদের উভয়কে ডেকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম শুনিয়ে দিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের হুকুমটি নাকচ করে দিলেন।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত।

বিষয়-সংক্ষেপ ঃ এ আয়াতের দ্বারা মূলনীতিস্বরূপ যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্যও থাকবে না। বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমত পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়ত নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

প্রথম কারণটি হল, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। তাছাড়া এ কথাও বলা যেতে পারে যে, একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল ঃ (১) যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা ; (২) তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ, নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোশ ও মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

সার কথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। তাহল এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতা বিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হল পুরুষের শাসিত ও অধীন।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণী রয়েছে। একটি হল তাদের শ্রেণী যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সে-সমস্ত নারীর, যারা যথার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি। প্রথম শ্রেণীর নারীরা পারিবারিক ও বৈষয়িক শান্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই যিম্মাদার। তাদের কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বাতলানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে ; তৃতীয় কোন লোকের যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা আনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল। আর পুরুষও মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পেল। এভাবে উভয়েই দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এবং উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রসূল করীম (সা) পছন্দ করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, "ভাল লোক এমন করে না।"

যা হোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا—অর্থাৎ যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষ অনুসন্ধান করতে যেও না ; বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেন নি। আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে ; তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধান ঃ উল্লিখিত ব্যবস্থাটি ছিল—এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক, এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না ; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণত এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদ আরোপ করে বেড়ায়, যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে কোরআনে-করীম এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয় পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী এবং মুসলমান দলকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনাও প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর অপবাদ আরোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপস-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসিত না হ'লেও অন্তত পরিবারের মধ্যেই যেন তা হয় ; আদালতে মামলা-মোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে।

আর তা হল এই যে, সরকার উভয় পক্ষের মুরব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حكم (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কোরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত, দিয়ানতদারও হবেন।

সার কথা, একজন সালিস পুরুষের (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। সেখানে গিয়ে এতদুভয়ে কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কি হবে--কোরআনে-করীম তা স্থির করে দেয়নি। অবশ্য বর্ণনাশেষে একটি বাক্য ঃ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেবেন।

এ বাক্যটির দ্বারা দু'টি বিষয় বোঝা যায় ঃ

(এক) আপস-মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকার-ভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের গায়েবী সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবেন। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ্ তা'আলা সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদ্বয়ের যে কোন একজনের মনে হয়তো নিস্বার্থতার অভাব ছিল।

(দুই) এ বাক্যের দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, দু'পক্ষের দু'জন সালিসকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকীল, প্রতি-নিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং একথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাই মেনে নেব। এ ক্ষেত্রে এই সালিসদ্বয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হবে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও হযরত আবূ হানীফা (র) প্রমুখেরও এমনি মত।---(রূহুল মা'আনী)

হযরত আলী (রা)-র সামনে একবার এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপস মীমাংসা ছাড়া উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোন অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয় পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা)-র খেদমতে হাযির হল। তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রা) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস

নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদেরকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত ? শোন, তোমরা যদি এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপস করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই কর। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপস মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। এ কথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি---এতদুভয় সালিস আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে যে ফয়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি।

কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া কিংবা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোন-ক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোন রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন।

হযরত আলী (রা) বললেন, না তা হয় না। তোমারও সালিসদেরকে তেমনি অধিকার দেওয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনার দ্বারা কোন কোন মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের অধিকারসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন, হযরত আলী (রা) উভয় পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকারসম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র) ও হযরত হাসান বসরী (র) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অধিকারসম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রা) কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদ্বয় অধিকারসম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকারসম্পন্ন হয়ে যায়।

কোরআন-করীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়। তার মাধ্যমে বহু মামলা-মোকদ্দমা আদালতে যাবার পূর্বেই পারিবারিক কিংবা সামাজিক পঞ্চায়েতে মীমাংসা করা যেতে পারে।

অন্যান্য বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রেও সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করা সমীচীন ঃ ফিকহ্‌বিদ মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, দু'জন হাকাম বা সালিস পাঠানোর এ পদ্ধতিটি শুধু স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা উচিত নয়, বরং অন্যান্য বিবাদ-বিসংবাদের বেলায়ও এ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া বান্ছনীয়। বিশেষত বিবাদকারীরা যদি পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়। কারণ, আদালতী সিদ্ধান্তে বিবাদের সাময়িক সমাধান হলেও তার ফলে মনের অভ্যন্তরে এমন কালিমা ও মলিনতার ছাপ থেকে যায়, যা পরবর্তীকালে অত্যন্ত অশোভন আকারে প্রকাশ পায়। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর কাযীদের জন্য ফরমান জারি করেছিলেন ঃ

رد والقضاء بين ذوى الارحام حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث الضغائن -

অর্থাৎ "আত্মীয়-স্বজনের মধ্যকার মামলা-মোকদ্দমা তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দাও, যাতে তারা পরিবারের সাহায্যে পারস্পরিক মীমাংসার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। কারণ, কাযীর মীমাংসা অনেক ক্ষেত্রে মনের বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

হানাফী মাযহাবের অনুগামী ফকীহ্দের মধ্যে কাযী কুদ্স, আলাউদ্দীন তারাবলুসী (র) তাঁর 'মুঈনুল আহ্কাম' গ্রন্থে এবং ইবনে শাহ্না (র) তাঁর 'লিসানুল-আহ্কাম' গ্রন্থে উল্লিখিত ফারূকী নির্দেশকে এমন পঞ্চায়েতী মীমাংসার ভিত্তিতে পরিণত করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-মীমাংসার কোন পন্থা উদ্ভাবন করা যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও লিখেছেন যে, যদিও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশনামায় এ হুকুমটি আত্মীয়-স্বজনের বিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু হুকুমনামায় তার যেসব কারণ ও তাৎপর্যের উল্লেখ রয়েছে যে, আদালতী সিদ্ধান্ত মানুষের মনে কালিমা সৃষ্টি করে দেয়--- এটা আত্মীয়-স্বজন এবং অনাত্মীয় উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, পারস্পরিক মনোমালিন্য ও বিদ্বেষ থেকে সমস্ত মুসলমানেরই বেঁচে থাকা কর্তব্য। সুতরাং বিচারক ও কর্তৃপক্ষের জন্য কোন মামলার শুনানির প্রাক্কালে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিষয়টি আপস-নিষ্পত্তির চেষ্টা করাই সমীচীন।

যা হোক, উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন এক যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে, যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে সমগ্র বিশ্বের বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সমাধান হয়ে যেতে পারে। নারী-পুরুষ সবাই নিশ্চিন্ত ও নিঃশংক চিত্তে নিজেদের পারিবারিক জীবনকে সাক্ষাৎ স্বর্গীয় জীবনের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে পারে। আর পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদের পরিণতিতে যেসব গোত্রীয়, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত ঘটে, সেসবের মাঝে শান্তি নেমে আসতে পারে।

পরিশেষে আবারও এই বিস্ময়কর কোরআনী বিধি-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা যাক, যা পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তিকল্পে বিশ্বকে দান করেছে---

১. ঘরের বিবাদ ঘরেই ক্রমান্বয়ে মিটিয়ে দিতে হবে।

২, তা সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ পরিবারের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সালিসের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেবেন, যাতে করে ঘরের ব্যাপার ঘরে না হলেও পরিবারের ভেতরেই সীমিত থেকে সমাধান হয়ে যায়।

৩. আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে শেষ পর্যন্ত আদালতের আশ্রয় নেবে এবং আদালত উভয় পক্ষের অবস্থা ও ঘটনা তদন্ত করে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করবে।

আয়াতের শেষাংশে إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا বলে উল্লিখিত সালিসদ্বয়কেও সতর্ক

করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি কোন অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ কর, তবে তোমাদেরকেও যে একজন বিজ্ঞ-অবহিত সত্তার সম্মুখীন হতে হবে, তা মনে রেখো।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَۨا ۝ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
رِئَاۗءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّكُنِ
الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۗءَ قَرِيْنًا ۝

(৩৬) আর ইবাদত করো আল্লাহ্‌র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে—(৩৭) যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে—বস্তুত তৈরী করে রেখেছি কাফিরদের জন্য অপমানজনক আযাব। (৩৮) আর সেই সমস্ত লোক, যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয়, সে হল নিকৃষ্টতর সাথী!

যোগসূত্র ঃ সূরা নিসার তফসীর প্রসঙ্গে পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ সূরায় হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের হকের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের হকের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনার পর ইয়াতীম-অনাথ ও নারীদের হক বা অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দান এবং তাতে শৈথিল্য করা হলে তার শাস্তি ও ভীতি, এ পৃথিবীতে এতদুভয় দুর্বল শ্রেণী অর্থাৎ নারী ও শিশুদের প্রতি যে উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং যেসব উৎপীড়নমূলক প্রথা-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর সংস্কার এবং অতঃপর উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর পিতা-মাতা

ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের অধিকার সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়ের বিশদ আলোচনা আসছে। আর যেহেতু এ সমস্ত অধিকার বা হক পরিপূর্ণভাবে সেই ব্যক্তিই আদায় করতে পারে, যে আল্লাহ্, রসূল ও কিয়ামত-আখিরাতের ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস পোষণ করে এবং অধিকন্তু কার্পণ্য, কিবর, অহমিকা ও লোক-দেখানো প্রভৃতি বিষয় থেকে এজন্য বেঁচে থাকে যে, এগুলো অধিকার আদায়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই এ আয়াতসমূহে তওহীদ, অনুপ্রেরণা ও ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। আর শির্ক করা, কিয়ামতকে অস্বীকার করা, রসূলের অবাধ্যতা ও কার্পণ্য প্রভৃতি নৈতিক ত্রুটিসমূহের নিন্দা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর (এতে তওহীদও অন্তর্ভুক্ত) এবং তাঁর সাথে কোন বস্তুকে (তা মানুষই হোক অথবা অন্য কিছু হোক ইবাদতের বেলায় কিংবা তাঁর বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিশ্বাসগতভাবে) শরীক করো না। আর (স্বীয়) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর (এবং সদ্ব্যবহার কর) নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতীম-অনাথদের সাথে, গরীব-মিসকীনদের সাথে এবং নিকটবর্তী পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ও দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথে এবং সহাবস্থানকারী বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও (তা সে সহাবস্থান সুদীর্ঘ সফর কিংবা কোন বৈধ কাজের অংশীদার প্রভৃতির মত দীর্ঘস্থায়ী হোক অথবা কোন সংক্ষিপ্ত সফর কিংবা ক্ষণিকের বৈঠক কালেই হোক)। আর পথিক-মুসাফিরের সাথেও (তা সে তোমাদের বিশেষ কোন মেহমান হোক বা না হোক)। এবং সে সমস্ত গোলাম-বাঁদীর সাথেও, যারা (শরীয়তসঙ্গতভাবে) তোমাদের অধিকারভুক্ত। (সারকথা, এমন সবার সাথেই সদাচরণ কর অন্যান্য স্থানে শরীয়ত যার বিস্তারিত বিবরণ বাতলে দিয়েছে। বস্তুত যেসব লোক এসব হক বা অধিকার আদায় করে না---অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কয়েকটি কারণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে; হয় স্বভাবের দাম্ভিকতার দরুন কাউকে মানুষ বলেই গণ্য করে না এবং কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, কিংবা মনের উপর কার্পণ্যের প্রবল প্রভাব হেতু কাউকে কোন কিছু দান করতে প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়ে যায়, অথবা রসূলে-করীম (সা)-এর প্রতি বিশ্বাসের অভাবের কারণে তাঁর হুকুম-আহ্কাম, অন্যের হক আদায় করার জন্য পুণ্য লাভ সংক্রান্ত ওয়াদা এবং অন্যের হক আদায় না করার জন্য আযাব ও ভীতি প্রদর্শনকে যথার্থ বলেই মনে করে না। অথচ এমন করা কুফর। লোক দেখানো ও নাম-যশের প্রবণতা তাদের মনে চেপে বসে। আর সেজন্য তারা যেখানে যশ-খ্যাতির আশা দেখা যায়, সেখানেই ব্যয় করে---তা ন্যায়সঙ্গত হোক আর নাই হোক। পক্ষান্তরে যেখানে যশ-খ্যাতির সম্ভাবনা নেই, সেখানে ন্যায়সঙ্গত হলেও ব্যয় করবে না। অথবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁদের আদৌ বিশ্বাস থাকে না। কিংবা কিয়ামতের উপরই তাদের বিশ্বাস থাকে না, অথচ এটাও কুফরী। যারা পৃথকভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে এ সমস্ত বিষয় অবলম্বন করে তাদের অবস্থা সম্পর্কেও জেনে নাও---) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকদের সাথে মুহাব্বত রাখেন না, যারা (মনে মনে) নিজেকে বড় বলে মনে করে, (মুখে) দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলে, যারা কার্পণ্য করে এবং অন্যকে কার্পণ্য করার তালীম দেয় (তা মুখে বলার

মাধ্যমেই হোক কিংবা তাদের কাজকর্মে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমেই হোক) এবং তারা সে-সব বিষয় গোপন করে রাখে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দান করেছেন। (এর মর্ম হল এই যে, সেই ধন-সম্পদ, যা তারা কোন রকম কল্যাণের তাকীদে নয়, বরং একান্ত কার্পণ্যের দরুন গোপন রাখে, যাতে হকদাররা তাদের কাছে নিজেদের হক বা অধিকার প্রাপ্তির আশা না করে। কিংবা এতে সেই ধর্মীয় জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যা গোপন করা হয়। কারণ, ইহুদীরা জানা সত্ত্বেও রিসালতের বিষয়টি গোপন করছিল। এভাবে কার্পণ্যের বিষয়টি ব্যাপক হয়ে যায়, যাতে কৃপণ ও রিসালতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।) আর আমি এহেন অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য (যারা ধন-সম্পদ সংক্রান্ত নিয়ামত অথবা রসূল প্রেরণ সংক্রান্ত নিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করে না) অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না, (তাদের অবস্থাও একই রকম ---আল্লাহ্ তাদেরকেও ভালবাসেন না)। আর আসল কথা হল এই যে, শয়তান যাদের দোসর হবে (যেমন, হয়েছিল উল্লিখিত লোকদের), সে হল নিকৃষ্টতর দোসর। (সে এমন সব পরামর্শ দেয়, যার পরিণতিতে সাধিত হয় কঠিন ক্ষতি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে তওহীদের আলোচনার কারণ ঃ হক বা অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আল্লাহ্র আনুগত্য ইবাদত-বন্দেগী ও তওহীদের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ইবাদতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে ইবাদত-বন্দেগী ও তওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় এবং তার হুকুম-আহ্কামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য অধিকার রক্ষার নিষ্ঠাও আশা করা যায় না। মানব গোষ্ঠী, সমাজের রীতিনীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই হাজারো পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তা হলো আল্লাহ্র ভয় ও পরহিযগারী। আর এই আল্লাহ্-ভীতি ও পরহিযগারী শুধুমাত্র তওহীদের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তওহীদ ও ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা একান্তই সঙ্গত।

তওহীদের পর পিতা-মাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা ঃ অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইবাদত-বন্দেগী ও হকসমূহের পর পরই পিতা-মাতার হক

সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন ও বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে বাহ্যত পিতা-মাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানত-দার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কোরআন করীমের অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

অর্থাৎ আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর।

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا -

(অর্থাৎ আর যখন আমি বনী-ইসরাঈলদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।) আয়াত দু'টিতে পিতা-মাতার ব্যাপারে একথা বলা হয়নি যে, তাদের হকসমূহ আদায় করবে কিংবা তাদের সেবাযত্ন করবে, বরং বলা হয়েছে তাদের প্রতি إحسان (ইহসান) করবে। এ শব্দের সাধারণ মর্মে একথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, প্রয়োজনবোধে তাঁদের খোরপোশের জন্য স্বীয় সম্পদ ব্যয় করবে, প্রয়োজনানুপাতে দৈহিক সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং তাদের সাথে কথা বলার সময় কঠোর ভাষায় এবং জোরে কথা বলবে না। এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করবে না, যাতে তাদের মনে কষ্ট হতে পারে। এমনকি তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সাথেও এমন কোন আচরণ করবে না, যাতে পিতা-মাতা মানসিকভাবে আহত হতে পারেন। বরং তাদেরকে সুখী করার জন্য, তাদের মানসিক শান্তির নিমিত্ত যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তা সবই করবে। পিতা-মাতা যদি সন্তান-সন্ততির হক আদায়ের বেলায় শৈথিল্যও প্রদর্শন করে, তথাপি তাদের সাথে কোন রকম অসদাচরণ করার কোন অবকাশ নেই।

হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রসূলে করীম (সা) দশটি অসিয়ত করে-ছিলেন। তন্মধ্যে (১) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদি তোমাদেরকে সেজন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয়। (২) নিজের পিতা-মাতার নাফরমানী কিংবা তাঁদের মনে কষ্ট দেবে না, যদি তাঁরা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর।—(মসনদে আহমদ)

রসূলে করীম (সা)-এর বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে লোক নিজের রিযিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার পক্ষে সেলায়ে-রেহমী অর্থাৎ নিজের আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ আদায় করা উচিত।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

'শোয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (র) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতা-মাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি করে মকবুল হজ্জের সওয়াব প্রাপ্ত হয়।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, সমস্ত গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক পিতা-মাতার নাফরমানী এবং তাঁদের মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত করে দেওয়া হয়।

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ ঃ উল্লিখিত আয়াতে পিতা-মাতার পরে পরেই সাধারণ ذى القربى অর্থাৎ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ দেওয়া হয়েছে। কোরআন করীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা হুযুর (সা) প্রায়শই বিভিন্ন ভাষণের পর তিলাওয়াত করতেন। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য।" এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবাযত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সালমান ইবনে 'আমের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হল সেলায়ে-রেহমীর সওয়াব অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।—(মসনদে আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং তার পরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে।

ইয়াতীম-মিসকীনের হক ঃ তৃতীয় পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ ইয়াতীম ও মিসকীনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও সূরার প্রথম-ভাগে এসে গেছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, না-ওয়ারিস তথা অন্যান্য শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহায়-তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-স্বজনদের বেলায় করে থাক।

প্রতিবেশীর হক ঃ চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى (এবং নিকট প্রতিবেশীর)---পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ جَارِ---وَالْجَارِ الْجُنُبِ শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। এ আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। (১) جار ذى القربى (২) جار الجنب এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে-কিরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ جار ذى القربى বলতে সেই সব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর جار جنب বলতে শুধুমাত্র সেই প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

কোন কোন তফসীরকার মনীষী বলেছেন, 'জারে যিলকোরবা' এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান। আর 'জারে জুনুব' বলা হয় অমুসলমান প্রতিবেশীকে।

কোরআনে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ এটাই সম্ভবত বোঝাতে চায়। তাছাড়া বাস্তবতার দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ থাকাটা একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে। আর প্রতিবেশীদের আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় হওয়ার দিক দিয়েও প্রতিবেশী সে নিকটবর্তী হোক অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান---যে-কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেওয়া কর্তব্য।

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সা) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, "কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে, যাদের হক মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু'টি এবং কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হল এমন অমুসলমান, যাদের সাথে কোন আত্মীয়তাই নেই। দুই হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হল তারা, যারা একই সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়।"—(ইবনে কাসীর)

রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জিবরাঈল (আ) সদাসর্বদাই আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তাদের সাহায্য-সহায়তার তাকীদ করতেন। এমনকি (তাঁর তাকীদের দরুন) আমার ধারণা হতে থাকে হয়তো বা প্রতিবেশীদেরও আত্মীয়দের মতই মীরাসের অংশীদার করে দেওয়া হবে।—(বুখারী)

তিরমিযী ও মস্নদে আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, "কোন মহল্লার লোকদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সেই লোকই সবচাইতে উত্তম, যে স্বীয় প্রতিবেশীদের হক আদায়ের ব্যাপারে উত্তম।

মস্নদে আহমদে উদ্ধৃত অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে কোন প্রতিবেশীর জন্য পেট ভরে খাওয়া জায়েয নয়।

সহকর্মীদের হক ঃ ষষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ—এর শাব্দিক অর্থ হল সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস-মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে।

ইসলামী শরীয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সেই ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান—সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়েত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোন রকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন সিগারেট পান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমন ভাবে বসা, যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি।

কোরআনে-করীমের এ হেদায়েত অনুযায়ী যদি সবাই আমল করতে শুরু করে, তাহলে রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতিতে সফরের সময় সংঘটিত সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের

পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আমার শুধুমাত্র একজনের জায়গারই অধিকার রয়েছে, তার বেশী জায়গা দখল করে রাখার কোন অধিকার নেই। রেলে (বা অন্যান্য যানবাহনে) অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা উচিত যে, এখানে তারও ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই সাহেবে-বিল-জাম্ব-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক।---(রূহুল মা'আনী)

পথিকের হক ঃ সপ্তম পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَابْنِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ পথিক। এতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে, যে সফরের অবস্থায় আপনার কাছে এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহ্মান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় সম্পর্কের লোক সেখানে উপস্থিত নেই, তাই কোরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে অর্থাৎ সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

গোলাম-বাঁদী ও কর্মচারীর হক ঃ অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ এতে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী খাওয়া-পরার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাদের দ্বারা করাবে না।

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রসূলে করীম (সা)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানা-পিনা প্রভৃতির ব্যাপারে বিলম্ব বা কার্পণ্য করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না।

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে, যাদের মনে দাম্ভিকতা বিদ্যমান ঃ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে।

আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সেসব লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় গর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। আল্লাহ্ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন।

দাম্ভিকতা এবং মূর্খতাজনিত গর্ব সম্পর্কে বহু হাদীসে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এক হাদীসে আছে ঃ

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد فى قلبه مثقال حبّة من خردل من ايمان ولا يدخل الجنّة احد فى قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر -

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সে লোক (চিরকালের জন্য) জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার মনে রাই পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আর এমন কোন লোকও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার মনে রাই পরিমাণ অহংকার বা দাম্ভিকতা রয়েছে।---(মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৩৩)

অন্য এক হাদীসে যাতে দম্ভের সংজ্ঞাও দেওয়া রয়েছে---উল্লিখিত আছে ঃ

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنّة من كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر فقال رجل انّ الرجل يحبّ ان يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا - قال ان الله تعالٰى جميل يحب الجمال - الكبر بطر الحق وغمط الناس -

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সেই লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার মনে অণু পরিমাণ অহংকার বা দম্ভ বিদ্যমান রয়েছে। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল হোক, জুতা জোড়া সুন্দর হোক, এটা সবাই চায়; তাহলে কি এটাও অহংকার বা তাকাব্বুর হবে ? হুযুর (সা) বললেন, আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। বস্তুত "তাকাব্বুর হল হক

---(মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৩৩)

অতঃপর اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য অবলম্বন করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করে।

আয়াতে যে بُخْل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণত অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-নযুল পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে بُخْل বা 'কার্পণ্য' শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দাম্ভিক ও অসম্ভব রকম কৃপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় যেমন কৃপণতা করত, তেমনি সেই সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের ইলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সেই সমস্ত জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী (সা)-র আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও তাঁর লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেওয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত---না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে বলত।

পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং ইল্‌ম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব।

দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا -

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্, সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্, কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও। ---(বুখারী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

عن اسماء (رض) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْفِقِىْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِى فَيُوعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ ০

অর্থাৎ হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, হে আসমা! সৎ ও কল্যাণের পথে ব্যয় করতে থাক আর গুণে গুণে ব্যয়

করো না। তাহলে আল্লাহ্ও তোমার বেলায় গুণতে শুরু করবেন। তাছাড়া সৎ পথে ব্যয় করা থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে (ধন-সম্পদের) অতিরিক্ত হিফাযত করতে যেও না। তাহলে আল্লাহ্ও হিফাযত করতে শুরু করবেন। আর তোমার দ্বারা যেটুকু দান করা সম্ভব, তা দিতে বিলম্ব করো না।---(বুখারী, মুসলিম)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخىّ قريب من الله قريب من الجنّة قريب من الناس بعيد من النار - والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنّة بعيد من الناس قريب من النار، وجاهل سخىّ احبّ الى الله من عابد بخيل -

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটবর্তী, জান্নাতেরও নিকটবর্তী এবং মানুষের দৃষ্টিতেও পছন্দনীয়, আর জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে। পক্ষান্তরে বখীল বা কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছ থেকেও দূরবর্তী, জান্নাত থেকেও দূরবর্তী, মানুষের কাছেও ঘৃণিত এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। বস্তুত একজন জাহিল বা মূর্খ দানশীল (যদি যথাযথভাবে নির্ধারিত ফরযসমূহ সম্পাদন করে এবং হারাম কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে তবে), সে কৃপণ অপেক্ষা উত্তম, যে ইবাদতে নিয়মানুবর্তী।---(তিরমিযী)

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لاتجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق ০

অর্থাৎ "হযরত আবূ সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, দু'টি অভ্যাস রয়েছে যা কোন মু'মিন ব্যক্তির মাঝে সমবেত হতে পারে না---(১) কার্পণ্য (২) অসদাচরণ।---(তিরমিযী)

অতঃপর اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ বাক্যের দ্বারা দাম্ভিকদের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে, এসব লোক আল্লাহ্র পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না, সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নও উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর

উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শিরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে ঃ

عن ابى هُريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنَا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركتُه وَشِرْكَهُ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি শিরক বা অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ; যে লোক কোন নেক আমল করে এবং তাঁতে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করে, তখন আমি সে আমলটি শরীকের জন্যই ছেড়ে দিই এবং যে লোক সে আমল করে তাকেও বর্জন করি।

عن شداد بن اوس قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلّى يرائى فقد اشرك ومن صَام يرائى فقد اشرك، ومن تصدّق يرائى فقد اشركَ ـ

অর্থাৎ শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল, সে শিরকী করল, যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখল, সে শিরকী করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করল, সে শিরকী করল।—(মসনদে আহমদ)

عن محمود بن لبيد انّ النبى صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الا صغر، قالوا يارسول الله وَمَا الشرك الا صغر، قال الرّياء ـ

অর্থাৎ "মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্য আমার সবচেয়ে বেশী আশংকা হয় 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরকী সম্পর্কে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, ছোট শিরকী কি ? হুযুর বললেন, তা হল 'রিয়া' বা লোকদেখানো।"

বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসে বাড়তি একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন সৎ আমলসমূহের সওয়াব বন্টন করা হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রিয়াকারদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা সে সমস্ত লোকের কাছে যাও, যাদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে তোমরা দুনিয়াতে নেক আমল করতে আর সেখানে গিয়ে দেখ, তাদের কাছে তোমাদের কৃত নেক আমলের জন্য কি সওয়াব এবং কি প্রতিদান রয়েছে।"

اللّٰهُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ
تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ اِذَا
جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾
يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۚ
وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

(৩৯) আর কিইবা ক্ষতি হত তাদের, যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে! অথচ আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত! (৪০) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কারও প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন। (৪১) আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং তোমাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারী! (৪২) সেদিন কামনা করবে সেই সমস্ত লোক, যারা কাফির হয়েছিল এবং রসূলের নাফরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহ্‌র কাছে কোন বিষয়।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং কার্পণ্য প্রভৃতি বিষয়ের নিন্দাবাদের বিবরণ ছিল। অতঃপর আলোচ্য এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। আর সবশেষে হাশর অনুষ্ঠানের বিবরণ দান পূর্বক সে সমস্ত লোকদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা ঈমান আনে না এবং নেক আমল করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদের উপর কি (এমন) বিপদ নেমে আসবে যদি তারা আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ বিচার দিবসের উপর (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের উপর) ঈমান নিয়ে আসে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু তাদের দান করেছেন, তা থেকে কিছু (নিঃস্বার্থভাবে) ব্যয় করতে থাকে? (অর্থাৎ ক্ষতি কিছুই হবে না, বরং সব রকমেই লাভ হবে।) বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সৎ-অসৎ কার্যকলাপ) সম্পর্কে সম্যক অবগত (সুতরাং তিনি ঈমান ও সৎকাজে ব্যয়ের জন্য সওয়াব দান করবেন এবং কুফরী প্রভৃতির জন্য আযাব দেবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা একটি অণু পরিমাণও জুলুম করবেন না (কারো প্রাপ্য সওয়াব

দেবেন না অথবা অকারণে কাউকে আযাব দিয়ে বসবেন, যা বাহ্যত অন্যায়---তা কখনও হবে না)। আর (বরং তিনি হলেন এমন সদয়-করুণাময় যে,) যদি কেউ একটি নেকী করে, তবে তাকে তিনি দ্বিগুণ করে সওয়াব দান করবেন (যেমন, অন্যান্য আয়াতে ওয়াদা বর্ণিত রয়েছে)। তাছাড়া (প্রতিশ্রুত এই সওয়াব ছাড়াও) নিজের পক্ষ থেকে (আমলের বিনিময় ছাড়াও পুরস্কার-স্বরূপ পৃথকভাবে) মহাদানে বিভূষিত করবেন। সুতরাং তখনই বা কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে একেকজন সাক্ষী উপস্থিত করবেন এবং (আপনার সাথে যাদের মোকাবিলা হয়েছে) সেসব লোকের উপর সাক্ষ্যদানের জন্য আপনাকে উপস্থিত করবেন? (অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী মান্য করে নি, তাদের বিষয় উপস্থাপনকালে সরকারী সাক্ষী হিসাবে নবী-রসূলগণের এজহার শ্রবণ করা হবে। যে সমস্ত বিষয় নবী-রসূলগণের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় তাঁরা প্রকাশ করবেন। এই সাক্ষ্যদানের পর সেসব বিরুদ্ধবাদীদের অপরাধ প্রমাণ করিয়ে তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। উপরে বলা হয়েছিল যে, তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? অতঃপর স্বয়ং আল্লাহ্ সে অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন,) সেদিন (অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে,) যে সমস্ত লোক (পৃথিবীতে অবস্থানকালে) কুফরী অবলম্বন করেছে এবং রসূলগণের কথা অমান্য করেছে, তারা এমন কামনা করবে যে, হায় (এক্ষণই যদি) আমরা মাটির সমান হয়ে মিশে যেতাম! (যাতে এহেন অপমান ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।) এবং (বাইরের সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াও স্বীকারোক্তিক্রমেও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কারণ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে (এমন) কোন বিষয়ই গোপন করতে পারবে না (যা তারা পৃথিবীতে করে থাকবে। বস্তুত তাদেরকে উভয় প্রকারেই অপরাধী প্রতিপন্ন করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ---অর্থাৎ তাদের ক্ষতিটা কি হবে এবং তাদের এমন কি বিপদই বা হবে, যদি তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ কাজ। এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনই কষ্টের বিষয় নয়, তবুও কেন নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ থেকে আখিরাতে ধ্বংসের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও কোন সৎকর্মের সওয়াব এবং শুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখিরাতে এগুলোকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তার সওয়াব দান করবেন, বরং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিম্নতম সওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে একটি সৎকাজের জন্য দশ-দশটি সওয়াব লেখা হয় এবং তদুপরি নানা বাহানায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সৎকাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোর সওয়াব বিশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে (সৎকাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ —কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তার কি কল্পনা করা যেতে পারে ?

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ذَرَّةٌ শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, লাল রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিপঁড়েকে ذَرَّةٌ (যার্‌রাতুন) বলা হয়। আরবরা নিকৃষ্টতা ও ওজনহীনতার প্রেক্ষিতে একে উদাহরণস্বরূপ বলে থাকে।

كَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ বলে আখিরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফিরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে।

তাদের কি অবস্থা হবে যখন হাশরের মাঠে প্রত্যেক উম্মতের নবীদের নিজ নিজ উম্মতের নেক-বদ ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আর বিশেষ করে সেই কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদালতে সাক্ষী দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব মো'জেযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আপনার তওহীদ ও আমার রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কোরআন শোনাও। হযরত আবদুল্লাহ্ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান অথচ কোরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে ? হুযুর বললেন, হ্যাঁ, পড়। হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, অতঃপর আমি সূরা আন্-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। যখন فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ পর্যন্ত পৌঁছান, তখন তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে।

আল্লামা কুস্তলানী (র) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে হুযুর (সা)-এর সামনে আখিরাতের দৃশ্যাবলী উপস্থিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। আর সে জন্যই তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ هٰؤُلَاءِ-এর দ্বারা রসূলে করীম (সা)-এর সময়ে উপস্থিত কাফির-মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, হুযুরের উম্মতের যাবতীয় আমল হুযুরের সামনে উপস্থিত করা হতে থাকে।

যা হোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রসূলরা নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী (সা)-ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদান করবেন। কোরআন-করীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযুর (সা)-এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্যদান করতে পারেন। অন্যথায় কোরআন করীমে তাঁর (অর্থাৎ সে নবীর) এবং তাঁর সাক্ষ্য-দানের বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসাবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুয়তের একটি প্রমাণ।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا—আয়াতে ময়দানে আখিরাতে কাফিরদের দুরবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দু'ফাঁক হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখনকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম!

হাশরের মাঠে কাফিররা যখন দেখবে, সমস্ত জীবজন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং তাঁরা কামনা করবে—হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। যেমন, সূরা 'নাবা'-তে বলা হয়েছে وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا (আর কাফিররা বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম)।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا—অর্থাৎ এই কাফিররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রসূলরা সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, কাফিররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আল্লাহ্‌র কসম আমরা শিরক করিনি)। বাহ্যত এ দুটি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি হবে এমন যে, যখন প্রথমে কাফিররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা এ কথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরও নিজেদের শিরক ও অসৎ কর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয়তো আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে। এ জন্যই বলা হয়েছে وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

(৪৩) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ; আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, মুসাফিরী অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারীগমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও—তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল!

শানে নযূল ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা)-র ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে একবার হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) কতিপয় সাহাবীকে দাওয়াত করেছিলেন। তাতে মদ্যপানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভ্যাগত

মেহমানদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে যায়। নামাযে হযরত আলী (রা)-কে ইমাম নিযুক্ত করা হয়। নামাযের মাঝে নেশার দরুন 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' সূরার তিলাওয়াতে তিনি মারাত্মক ভুল করে বসেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেন নামায পড়া না হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যেও না (অর্থাৎ নামায পড়ো না), যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে সক্ষম হও, যা কিছু তোমরা মুখে উচ্চারণ করছ। (অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়ো না। এর মর্মার্থ এই যে, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া যেহেতু ফরয, আর এমন অবস্থা যেহেতু নামায আদায়ের পথে অন্তরায়, সেহেতু তোমরা নামাযের সময়ে নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার করো না; নামাযের মাঝে তোমাদের মুখ থেকে যেন কোন শরীয়ত বিরোধী বাক্য বেরিয়ে না পড়ে)। আর অপবিত্র অবস্থায়ও (অর্থাৎ ফরয গোসলের অবস্থায়ও নামাযে যেও না)। অবশ্য তোমাদের মুসাফিরী অবস্থার কথা স্বতন্ত্র (যার হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শীঘ্রই আলোচনা করা হচ্ছে)। যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও (অর্থাৎ ফরয গোসল করে নেওয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। আর নাপাক অবস্থায় গোসল ব্যতীত নামায না পড়ার যে হুকুম, তা হল কোন ওযর না থাকা অবস্থায়)। পক্ষান্তরে (তোমাদের যদি কোন ওযর থাকে---যেমন,) তোমরা যদি রোগাক্রান্ত হও (এবং তাতে পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হয়,) কিংবা (তোমরা) যদি মুসাফির অবস্থায় থাক (যার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে হুকুমও পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। অর্থাৎ পানি পাওয়া না গেলে অথবা রুগ্ন থাকলে তায়াম্মুমের অনুমতি দান। তাছাড়া তায়াম্মুমের বৈধতা শুধু এ দু'টি ওযরের জন্যই নয়, বরং তোমাদের বিশেষভাবে যদি এ দু'টি ওযরই থাকে) কিংবা (এই বিশেষ ওযর যদি না থাকে অর্থাৎ তোমরা মুসাফির কিংবা অসুস্থ নাও হও, বরং কারও যদি এমনিতেই অযু ভেঙে যায় কিংবা গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়---যেমন,) তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (প্রস্রাব-পায়খানা প্রভৃতি) প্রয়োজন সেরে আসে (যাতে অযু ভেঙে যায়) কিংবা তোমারা যদি স্ত্রীগমন করে থাক (যাতে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় এবং) অতঃপর (এ সমস্ত অবস্থায় তা রোগ বা সফরের ওযরই হোক কিংবা ওযু-গোসলের প্রয়োজনই হোক) তোমরা যদি পানি (ব্যবহার করার সুযোগ) না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেবে। (অর্থাৎ মাটিতে দু'হাত চাপড়ে নিয়ে) স্বীয় মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের উপর (হাত) ঘষে নেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা একান্ত ক্ষমাশীল, অনুগ্রহপরায়ণ (বস্তুত এগুলো যাঁর রীতি, তিনি যে নির্দেশ দান করেন, তা হয় সহজ। সেজন্যই আল্লাহ্ তোমাদের এমন সব নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমাদের কোন কষ্ট কিংবা জটিলতা না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শরাব হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলী ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামী শরীয়তকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি

সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাঁদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরনো অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনও এই দুষ্ট বস্তুর ধারে-কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদাভ্যাসে লিপ্ত। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মদ্যপান ও নেশা করা হারাম। বিশেষত ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেওয়া হলে মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য এ আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে-কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, নামাযের সময়ে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলমানরা উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাযে বাধা দান করে। (কাজেই দেখা গেল) অনেকে তখন থেকেই অর্থাৎ এ নির্দেশ আশার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

মাস'আলা ঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া যেমন হারাম, তেমনি কোন কোন মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামায পড়া জায়েয নয়, যাতে মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে ঃ

اذا نعس احدكم فى الصّلوٰة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه لايدرى لعله يستغفر فيسبّ نفسه ـ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কারও যদি নামাযের মাঝে তন্দ্রা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে তাকে কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়া উচিত, যাতে ঘুমের প্রভাব কেটে যায়। অন্যথায় ঘুমের ঘোরে সে বুঝতে পারবে না এবং দোয়া-এস্তেগফারের পরিবর্তে হয়তো নিজেই নিজেকে গালি দিতে থাকবে। —(কুরতুবী)

তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার, যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কতইনা অনুগ্রহ যে, তিনি ওযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক

বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলা বাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাস'আলা-মাসায়েল ফিকহ্‌র কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা-উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَلِيًّا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ
وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۙ وَلَٰكِن
لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

(৪৪) তুমি কি তাদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। (৪৫) অথচ আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর সমর্থক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৪৬) কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করেছি। তারা আরও বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, 'রায়িনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম। আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু তারা অতি অল্পসংখ্যক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি!) তুমি কি সে সমস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করনি, (অর্থাৎ দেখার মতই বটে! দেখলে বিস্মিত হবে---) যারা (আল্লাহ্‌র) কিতাব (তওরাতের জ্ঞান) থেকে একটা বিরাট অংশ প্রাপ্ত হয়েছে! (অর্থাৎ তওরাতের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) তারা গোমরাহী

(অর্থাৎ কুফরী) অবলম্বন করে চলছে এবং (নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়ে ছিলই, সাথে সাথে) এমনও কামনা করছে যাতে তোমরাও (সত্যপথ পরিহার করে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (অর্থাৎ সে জন্য তারা নানা রকম ব্যবস্থাও অবলম্বন করে থাকে। যেমন, তৃতীয় পারার শেষ দিকে এবং চতুর্থ পারার প্রথম দিকে তার কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে।) বস্তুত (তাদের সম্পর্কে যদি তোমরা অবহিত নাও থাক, তাতে কি) আল্লাহ্ (তো) তোমাদের (এ সমস্ত) শত্রু সম্পর্কে যথার্থই অবহিত রয়েছেন! (সে জন্যই তোমাদেরকে বলেও দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের থেকে বাঁচতে থাক।) অবশ্য (তাদের বিরোধিতার বিষয় শুনে খুব বেশী অস্থির হয়ে পড়ারও কোন কারণ নেই। কারণ) আল্লাহ্ (যে) তোমাদের পক্ষ সমর্থনকারী হিসাবে যথেষ্ট, (তিনিই তোমাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন) তাছাড়া আল্লাহ্ই তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট—(তাদের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন)। এসব লোক (যাদের কথা বলা হচ্ছে, এরা) হচ্ছে ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত। (আর এদের পথভ্রষ্টতা অবলম্বন সম্পর্কে যে কথা উপরে বলা হলো, তা হল এই যে, তারা আল্লাহ্র) কালাম (তওরাত)-কে তার নির্ধারিত লক্ষ্য (ও স্থান) থেকে (শব্দগত বা অর্থগতভাবে) অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। তাছাড়া (এদের আরেকটি গোমরাহী যাতে প্রতারিত হয়ে সরলপ্রাণ মানুষের ফেসে পড়াও অসম্ভব নয়, তাহল এই যে, এরা রসূলে-করীম [সা]-এর সাথে কথা বলার সময়) এমন বাক্য ব্যবহার করে (যার ভাল ও মন্দ দু'রকম অর্থই হতে পারে। এরা অবশ্য মন্দ অর্থেই তা ব্যবহার করত। অথচ প্রকাশ করত---যেন ভাল অর্থেই ব্যবহার করছে। আর এভাবে প্রতারিত হয়ে কোন কোন মুসলমানের পক্ষেও রসূলে-করীম (সা)-কে এ সমস্ত বাক্যে সম্বোধন করে ফেলা বিচিত্র ছিল না। অতএব সূরা-বাকারার দ্বাদশ রুকূতে 'রায়িনা' শব্দে রসূলকে সম্বোধন করতে মু'মিনগণকে বারণ করা হয়েছে। কাজেই এ হিসাবে ইহুদীদের এসব বাক্য বা শব্দের ব্যবহার অন্যদের জন্য এক রকম গোমরাহীরও কারণ হতে পারত। তা একান্ত মৌখিকই হোক না কেন। অতএব, يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا

---বাক্যে সে কথাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, مِنَ الَّذِينَ هَادُوا বাক্যটিতে

বিশ্লেষণ ছিল أَلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا —বাক্যের। আর يُحَرِّفُونَ -তে

বিশ্লেষণ ছিল يَشْتَرُونَ-এর। সে সমস্ত বাক্যের মধ্যে একটি ছিল--- سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا (অর্থাৎ আমরা শুনেছি এবং তা অমান্য করেছি)। এর ভাল অর্থ হচ্ছে এই যে,

আমরা আপনার বাণী শুনে নিয়েছি এবং আপনার কোন বিরোধী লোকের বক্তব্য যা আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারত, মান্য করিনি। (এছাড়া আরও একটি মন্দ দিক ছিল এই যে, আমরা আপনার কথা শুনেছি সত্য কিন্তু আমরা তাতে আমল করব না)। আর (দ্বিতীয় বাক্য ছিল--اسمع غير مسمع--এর শাব্দিক অর্থ হল এই যে, তোমরা আমার কথা শোন এবং আল্লাহ্ করুন, তোমাদের তিনি যেন কোন কথাই না শোনান। এর ভাল অর্থ এই যে, কোন বিরোধী ও কষ্টদায়ক কথা যেন শোনানো না হয়, বরং আপনার ভাগ্য যেন এমন সুপ্রসন্ন থাকে যে, আপনি যাই কিছু বলেন, তার প্রতি-উত্তরে যেন আপনাকে কোন প্রতিকূল বাক্য শুনতে না হয়; সব সময়ই যেন অনুকূল উত্তর শোনেন। আর মন্দ অর্থে এই দাঁড়ায় যে, আপনাকে যেন অনুকূল ও আনন্দজনক কোন কথাই শোনানো না হয়। বরং আপনি যাই কিছু বললেন, তারই উত্তরে যেন প্রতিকূল বাক্য আপনার কানে এসে পৌঁছায়)। আর (তৃতীয় বাক্য হল) راعنا-(এর ভাল ও মন্দ উভয় অর্থই সূরা-বাকারার তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ভাল অর্থ হল এই যে, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আর মন্দ অর্থ এই যে, ইহুদীদের ভাষায় এটি ছিল একটি গাল। যা হোক, এ সমস্ত বাক্য) এমনভাবে (তারা বলে) যে, তাদের মুখ (প্রশংসার ভঙ্গি থেকে হীনতার দিকে) ঘুরিয়ে নেয় এবং (মনের মধ্যেও থাকে) ধর্মের প্রতি কটাক্ষের (ও অসম্মানের) নিয়ত (তার কারণ, নবীর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাটাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মের প্রতি কটাক্ষ বিদ্রূপ)। বস্তুত এরা যদি (দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার না করে) এসব বাক্য বলত (অর্থাৎ যদি سمعنا وعصينا -এর স্থলে) سمعنا واطعنا (অর্থাৎ আমরা শুনে নিয়েছি এবং মান্যও করেছি।) এবং (اسمع غير مسمع -এর স্থলে শুধু) اسمع (অর্থাৎ আপনি শুনে নিন) আর (راعنا -এর স্থলে) انظرنا (অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখুন প্রভৃতি বাক্য বলত যাতে কুটিল-তার কোন অবকাশ নেই), তাহলে সেটিই ছিল তাদের জন্য মঙ্গলকর (ও লাভজনক)। তাছাড়া (প্রকৃতপক্ষে এগুলোই ছিল) সময়োচিতও বটে। কিন্তু (তারা তো এমন লাভ-জনক এবং যথোচিত কথা বললোই না, তদুপরি উল্লিখিত বাজে প্রলাপ বকতে থাকল। আর তাতে তাঁর মনে কষ্ট হলো, ফলে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কুফরীর দরুন (যাতে তাদের এ সমস্ত বাক্য এবং অন্যান্য কাফিরী কার্যকলাপ সবই অন্তর্ভুক্ত) স্বীয় (খাস) রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। কাজেই এখন আর তারা ঈমান আনবে না।

অবশ্য সামান্য কতিপয় লোক (ছাড়া যারা এ সমস্ত বাজে কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে ছিলেন তাঁরা ঈমানও এনেছেন এবং খাস রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিশাপ থেকেও মুক্ত রয়েছেন। যেমন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাকওয়া ও পরহিযগারীর বিষয় আলোচনা করা হয় এবং তাতে অধিকাংশই ছিল পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত। এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামায ও তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুকুম-আহকামও বলে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় ও আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি করে এবং তাতে করে পারস্পরিক লেন-দেনের সুষ্ঠুতা সূচিত হয়। উল্লিখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইহুদীদের দুষ্কর্মের প্রতিকার এবং বাক্য প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

(৪৭) হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের কাছে আছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি, যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আস্হাবে সাব্তের উপর। আর আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে (তওরাত) গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ, তোমরা এই গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের) উপর ঈমান আন, যা আমি নাযিল করেছি (এতে ঈমান আনতে গিয়ে তোমাদের ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি একে) এমনি অবস্থায় নাযিল করেছি যে, এটি তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহকেও সত্য বলে অভিহিত করে। (অর্থাৎ তোমাদের আসল কিতাবের জন্যও) এটি সত্যায়নকারী ; (অবশ্য বিকৃত অংশ তা থেকে আলাদা।) কাজেই তোমরা (সেই অনিশ্চিত বিষয়টি প্রকাশ পাবার) পূর্বেই (কোরআনের উপর) বিশ্বাস স্থাপন করে ফেল যে, আমি (তোমাদের) মুখমণ্ডল (-এর উপর অঙ্কিত চিত্র অর্থাৎ কান-চোখগুলো)-কে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে এবং সেগুলোকে (অর্থাৎ সে সমস্ত মুখমণ্ডলকে) উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেই কিংবা (যারা ঈমান আনবে না) তাদের উপর এমন (বিশেষ

ধরনের) অভিসম্পাত করি, যেমন হয়েছিল আসহাবে সাব্তের উপর। (ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বিগত হয়ে গেছে এবং যাদের আলোচনা সূরা-বাকারায় এসে গেছে অর্থাৎ এদেরকেও বাঁদরে রূপান্তরিত করার পূর্বে ঈমান আনা কর্তব্য।) বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার (যে) হুকুম একবার এসে যায়, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান না আনার কারণে যদি বিকৃতির হুকুম দিয়েই দেন, তাহলে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে (কাজেই এ ব্যাপারে তোমাদের ভীত হয়ে ঈমান নিয়ে আসা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র বাণী نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا (অর্থাৎ তাদের ঘুরিয়েদেব পশ্চাদ্দিকে)।

ঘুরিয়ে দেওয়া বা উল্টে দেওয়ার মাঝে দু'টি আশংকাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেওয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেওয়াও হতে পারে অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে, বরং গর্দানের মত পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেওয়া।—(মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আযাব কিয়ামতের প্রাক্কালে ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আযাব সংঘটিত হবার নয়। কারণ, তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (র) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ, কোরআনে এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই, যাতে বোঝা যায় যে, ঈমান যদি না আন, তবে অবশ্যই এ আযাব আসবে। বরং আশংকার উল্লেখ রয়েছে মাত্র অর্থাৎ যদি তাদের অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয়, তারা এমনি আযাবের যোগ্য। যদি আযাব দেওয়া না হয়, তবে সেটা তাঁর একান্ত অনুগ্রহের ব্যাপার।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٠﴾

(৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক

অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্‌র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (৪৯) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে; অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা তাকেই। বস্তুত তাদের উপর সূতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা (শাস্তিদানের পরেও) তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করার পাপকে ক্ষমা করবেন না (বরং তাদেরকে অনন্তকালের জন্য আযাবে নিপতিত করে রাখবেন)। আর এছাড়া অন্যান্য যত পাপ-তাপ রয়েছে (তা সগীরা গোনাহ্‌ই হোক, আর কবীরা গোনাহই হোক) যাকে ইচ্ছা (বিনা শাস্তিতেই) ক্ষমা করে দেবেন (অবশ্য সে মুশরিক যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে যেহেতু শিরকীরই অস্তিত্ব থাকে না, সেহেতু তাঁর সে শাস্তির অন্তহীনতাও থাকবে না)। আর (এই শিরকীকে ক্ষমা না করার কারণ হল এই যে,) আল্লাহ্‌র সাথে যে লোক (অন্যকে) শরীক (অংশীদার) সাব্যস্ত করে, সে (এমন) মহা অপরাধে অপরাধী হয়ে যায় (যা বিরাটত্বের কারণে ক্ষমাযোগ্যই নয়)।

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে অথচ (এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার। অবশ্য তাদের বলাতে কিছুই এসে যায় না,) বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, তাকেই পূত-পবিত্র বলে ঘোষণা করে দিতে পারেন। (এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া আল্লাহ্‌ কোরআনের মাধ্যমে মু'মিনগণকে পূত-পবিত্র বলে উল্লেখও করেছেন। যেমন, সূরা আ'লা-তে أَشْقَى [অর্থাৎ কাফির]-দের তুলনায় মু'মিন-দের সম্পর্কে বলেছেন ঃ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى——কাজেই তারাই হবেন পবিত্র; ইহুদীদের মত অকৃতজ্ঞ কাফিররা নয়)। আর (কুফরীকে ঈমান জ্ঞান করার দরুন এসব ইহুদীর এ মিথ্যা দাবীর জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য হবে, সে শাস্তির ব্যাপারে) তাদের প্রতি এক সূতা পরিমাণ অন্যায়ও করা হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা তাদের অপরাধের তুলনায় একটুও বেশী হবে না। বরং এমন অপরাধের জন্য এমন শাস্তিই হবে যা যথার্থ। একটু লক্ষ্য করে) দেখ দেখি, (নিজেদের পবিত্রতা সংক্রান্ত দাবীর ক্ষেত্রে) এরা আল্লাহ্‌র প্রতি কেমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে! (কারণ, যখন তারা তাদের কাফির হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত বলে দাবী করে, তখন তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কুফরীও আল্লাহ্‌ তা'আলার পছন্দের বিষয়। অথচ এটা একান্তই অপবাদ। কারণ, সমস্ত শরীয়তে আল্লাহ্‌ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, 'কুফর' আমার নিকট অত্যন্ত না-পছন্দ ও প্রত্যাখ্যাত বিষয়) আর (আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করার) এ বিষয়টি প্রকৃষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (সুতরাং এহেন কঠিন অপরাধের পরেও কি এমন শাস্তি দেওয়া কোন বাড়াবাড়ি বা অন্যায় হবে?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শির্কের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক ঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যে সব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হল শির্ক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা ঃ অর্থাৎ (১) কোন বুযুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। (২) কোন জ্যোতিষ-পণ্ডিতের কাছে গায়েবের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোন বুযুর্গের বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেওয়া অথবা (৪) কাউকে দূরে থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা (৫) কারো নামে রোযা রাখা।

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করা ঃ অর্থাৎ কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্য যাচ্ঞা করা। কারো কাছে রুযী-রোযগারের বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা।

ইবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা ঃ কাউকে সিজদা করা, কারো নামে কোন পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ী-ঘরের তাওয়াফ করা, আল্লাহ্ তা'আলার কোন হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোন প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া, কারো সামনে রুকূ করার মত অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কোরবানী করা, পার্থিব কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোন কোন মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ইহুদীরা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে---

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কিবর তথা অহমিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলত এই নিষিদ্ধতাও কিবরেরই জন্য হয়ে থাকে।

(২) দ্বিতীয়ত শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহিযগারীর মধ্যেই হবে কি না। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে

আখ্যায়িত করা আল্লাহ্-ভীতির পরিপন্থী। এক রেওয়ায়েতে হযরত সালমা বিনতে যয়নব (রা) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা) একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল برة (বাররাহ্ অর্থাৎ পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে হুযুর (সা) বললেন ঃ لاتزكوا انفسكم، الله اعلم باهل البرّ منكم، سموها زينب অর্থাৎ তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।---(মাযহারী)

(৩) নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হল এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সে লোক আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে। ----(বয়ানুল কোরআন)

মাস'আলা ঃ যদি উল্লিখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নিয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। ---(বয়ানুল কোরআন)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

(৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে বুত ও শয়তানকে এবং কাফিরদের বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল-সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরা হল সেই সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুত আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত জন !) তুমি কি সেই সমস্ত লোককে দেখনি, যারা (আসমানী) গ্রন্থ (তাওরাত)-এর জ্ঞানের একটি অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (কিন্তু তা সত্ত্বেও) তারা বুত ও শয়তানকে মান্য করে। (কারণ, অংশীবাদী মুশরিকদের ধর্ম ছিল পৌত্তলিকতা এবং শয়তানের আনুগত্য করা। এমনি ধর্মকে যখন ভাল বলা হয়, তখন মূর্তি ও শয়তানের

সমর্থনই প্রতীয়মান হয়ে যায়।) আর তারা (অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাবরা) কাফির (অর্থাৎ মুশরিকদের) সম্পর্কে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক সরল পথে রয়েছে। (এ কথাটি তারা পরিষ্কারভাবেই বলত)। এরা (যারা কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থার তুলনায় উত্তম বলে অভিহিত করে) ঐ সমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিশপ্ত করেছেন (এই অভিশপ্ততার কারণেই তো তারা এমন নিঃশঙ্কচিত্তে কুফরী বিষয় বলে চলেছে)। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অভিসম্পাতগ্রস্ত করে দেন, (আযাবের সময়) তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কঠোর শাস্তি হবে। কাজেই পৃথিবীতে তাদের কেউ নিহত হয়েছে, কেউ হয়েছে বন্দী, আবার কেউ হয়েছে লাঞ্ছিত প্রজা। আর আখিরাতে যা হবার তা তো রয়েই গেছে)।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াত اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ ---থেকে ইহুদীদের দুষ্কৃতি ও বদাভ্যাসসমূহের আলোচনা চলে আসছে এবং আলোচ্য আয়াতগুলোও তাদের সে সব দুষ্কর্মের সাথেই সম্পৃক্ত।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'জিবত' ও 'তাগূত'-এর মর্ম ঃ উল্লিখিত একান্নতম আয়াতে 'জিবত' ও 'তাগূত' দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় 'জিবত' বলা হয় যাদুকরকে। আর 'তাগূত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষকে।

হযরত উমর (রা) বলেন যে, 'জিবত' অর্থ যাদু এবং 'তাগূত' অর্থ শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা) বলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই 'তাগূত' বলে অভিহিত হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবনে আনাস (রা)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং 'তাগূত' থেকে বেঁচে থাক)। কিন্তু উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'জিবত' বুতেরই নাম ছিল, পরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে।--- (রূহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে

যে, ইহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনে আখতাব ও কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কোরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইহুদী সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ আবূ সুফিয়ানের কাছে এসে হুযুরে আকরাম (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবনে আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জিব্‌ত ও তাগূতের) সামনে সিজদা কর।

সুতরাং সে কোরাইশদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাই করল। তারপর কা'ব কোরাইশদেরকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশজন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশজন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা'বার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কা'বের এ প্রস্তাব কোরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবূ সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ (সা) ন্যায়ের উপর রয়েছেন।

তখন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দীন কি? আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজ্বের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদের দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর তওয়াফ করি, ওমরাহ্‌ আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সা) তাঁর পৈতৃক ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ (সা) গোমরাহ হয়ে গেছেন—(নাউযুবিল্লাহ্‌)।

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে তাদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন।—(রূহুল-মা'আনী)

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে ধর্ম ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয়ঃ কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত। সে আল্লাহ্‌তেই বিশ্বাস পোষণ করত এবং তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিষ্কে যখন রিপুরূপ কামনা-বাসনার পিশাচ চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে। কোরাইশরা তার সাথে ঐক্যজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের দেবদেবীর সামনে সিজদা করতে হবে। সে তাই মেনে নিল যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কোরাইশদের শর্ত বাস্তবায়িত করলো বটে কিন্তু স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াকে

পছন্দ করলো না। কোরআনে-করীম অন্য জায়গায় বাল্আম-বাউরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ط

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণ ও মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ তার ধর্ম হেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রিপুরূপ কামনা-বাসনার বলিতে পরিণত করা থেকে বাঁচতে পারে না। ইদানীং কোন কোন লোক জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বীয় সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম-বিবর্জিত বিশ্বাস ও মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। না তাদের মনে আল্লাহ্র সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন পরোয়া থাকে, আর না থাকে আখিরাতের কোন রকম ভয়-ভীতি। বস্তুত এ সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি।

তফসীরকাররা লিখেছেন যে, বাল্আম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদী আলিম ও উচ্চস্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মূসা (আ)-র বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করতে আরম্ভ করল, তখন মূসা (আ)-র কোনই ক্ষতি হলো না, কিন্তু সে নিজে গোমরাহ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হল।

আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ ঃ লা'নত বা অভি-সম্পাত-এর অর্থ হলো আল্লাহ্র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া অর্থাৎ চরম অপমান--অপদস্থতা অর্জন করা। যার উপর আল্লাহ্র লা'নত পতিত হয় সে কখনো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভৎর্সনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে আছে ঃ

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا -

অর্থাৎ "যাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হয়েছে, তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত কর।" এই তো গেল তাদের পার্থিব অপমান। আখিরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

আল্লাহ্র লা'নতের অধিকারী কারা? وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا —আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়, তার

কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র লা'নতের যোগ্য কারা?

এক হাদীসে আছে যে, রসূলে করীম (সা) সুদগ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেন-দেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।—(মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ অর্থাৎ "যে লোক লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।" অতঃপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুর চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্ত কর্তন করা হয়।—(মিশকাত)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لعن الله اكل الرّبو و مؤكله و الواشمة و المستوشمة و المصوّر অর্থাৎ সুদগ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত এবং সেই সমস্ত নারীর উপর, যারা নিজের শরীর খোদাই করে এবং যে অন্যের শরীরও খুদিয়ে দেয়। তেমনিভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত।

অপর এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি। যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি। —(মিশকাত)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ ছয় প্রকার লোক আছে, যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুস্তাজাযুদ্দাওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ্‌র কিতাবে যারা কাটছাঁট করে। (২) যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে এবং এমন সব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ্ অপদস্থ করেছেন আর এমন সব লোককে অপমানিত করে যাদেরকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন। (৩) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে। (৪) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু সামগ্রীকে হালাল মনে করে। (৫) বিশেষত আমার বংশধরদের মধ্যে সে-সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং (৬) যে লোক আমার সুন্নতকে বর্জন করে।—(বায়হাকী)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرءة والمرءة تلبس لبسة الرجل-

অর্থাৎ রসূলে করীম (সা) এমন পুরুষের প্রতি লা'নত করেছেন, যে স্ত্রীলোকের পোশাক পরে এবং এমন স্ত্রীলোকের উপরও লা'নত করেছেন, যে পুরুষের পোশাক পরে। ---(মিশকাত)

عن عائشة رضى الله عنها ان امرءة تلبس النعل قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء -

"হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট কোন এক স্ত্রীলোক পুরুষালি জুতা পরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র রসূল এহেন মহিলার উপর লা'নত করেছেন, যে পুরুষদের মত চালচলন অবলম্বন করে। --(আবূ দাউদ)

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعن النبى صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساءِ وقال اخرجوهم من بيوتكم -

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সা) সেই সমস্ত পুরুষের উপর লা'নত করেছেন, যারা নারীদের মত আকার-আকৃতি ধারণ করে হিজড়া সাজে এবং সেই সমস্ত নারীর উপরও লা'নত করেছেন যারা পুরুষালি আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর তিনি বলেছেন, এদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও।---(বুখারী)

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ

لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق اللهِ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন তাদের উপর যারা শরীর উৎকীর্ণ করে, যারা উৎকীর্ণ করায়, যারা ভ্রূকে সরু করার উদ্দেশ্যে ভ্রূর লোম উপড়ে ফেলে দেয় এবং তাদের উপর যারা সৌন্দর্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত করে।

লা'নতের বিধান ঃ লা'নত ও অভিসম্পাত করা যেমন কঠিন ও মন্দ কাজ তেমনি লা'নত করার ব্যাপারে কঠোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। কোন মুসলমানের উপর লা'নত করা হারাম। আর কোন কাফিরের প্রতি শুধুমাত্র তখনই লা'নত করা যেতে পারে, যখন কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এ ব্যাপারে রসূলে করীম (সা)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا البذى -

"হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে বিদ্রূপকারী, লা'নতকারী এবং অশ্লীলভাষী সে মু'মিন নয়।---(তিরমিযী)

عن ابى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا لعن شيئاً صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالاً فاذا لم تجد مساغاً رجعت الى الذى لعن فان كان لذلك اهلاً والا رجعت الى قائلها.

"হযরত আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, আমি রসূলে করীম (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দা যখন কোন কিছুর উপর লা'নত করে, তখন লা'নত আকাশের দিকে উঠে যায় কিন্তু আকাশের দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন সে যখন পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে থাকে, তখন পৃথিবীর দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয় (অর্থাৎ পৃথিবী সে লা'নত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে), তখন তা ডানে-বামে ঘুরতে থাকে এবং যখন কোথাও কোন পথ খুঁজে পায় না, তখন তা সে বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়, যার প্রতি লা'নত করা হয়েছিল। সত্য সত্যই যদি সেটি লা'নতের যোগ্য হয়ে থাকে, তবে তাতে গিয়ে পড়ে। অন্যথায় তা লা'নতকারীর উপরই এসে পতিত হয়।"

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رجلا تارعته الريح ردائه فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فانها مأمورة وانه من لعن شيئاً ليس له باهل رجعت اللعنة عليه.

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার বাতাস এক ব্যক্তির চাদর উড়িয়ে নিয়ে গেলে সে বাতাসের উপর লা'নত করতে লাগল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি এর উপর লা'নত করো না। কারণ, সে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত। আর স্মরণ রেখো যে লোক এমন বস্তুর উপর লা'নত করবে, যা তার যোগ্য নয়, তখন সে লা'নত ফিরে এসে লা'নতকারীর উপর পড়ে।"

মাস'আলা ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে, যদি সে ফাসিকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েয নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী ইয়াযীদের উপর লা'নত করতে বারণ করেছেন। তবে কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েয। যেমন, আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব প্রমুখ। ---(শামী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩৬)

মাস'আলা ঃ কারও নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, জালিমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক।

মাস'আলা ঃ লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফিরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মু'মিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী (সৎকর্মশীলদের) মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া। সে জন্যই কোন মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েয নয়।---(কাহ্‌তানী থেকে শামী কর্তৃক উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩৬)

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ
آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم
مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

(৫৩) তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৫৪) না কি যা কিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। (৫৫) অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে! বস্তুত (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হ্যাঁ, তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? এমতাবস্থায় তারা যে অন্য কাউকে কোন কিছুই দিত না। অথবা (তারা কি) সেসব লোকের সাথে (যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে) এ সমস্ত বিষয়ের কারণে ঈর্ষা পোষণ করে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে? সুতরাং (আপনার পক্ষে এমন বিষয় প্রাপ্ত হওয়াটা মোটেই নতুন কথা নয়। কারণ) আমি (পূর্ব থেকেই) হযরত ইবরাহীমের বংশধরদেরকে আসমানী কিতাবও দান করেছি এবং জ্ঞান ও হিকমত দান করেছি। (এ ছাড়া) আমি তাদেরকে বিশাল-বিপুল রাজ্যও দিয়েছি। (সুতরাং বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে বহু নবী হয়েছেন। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ), হযরত দাউদ (আ) প্রমুখ। হযরত দাউদ (আ) বহু বিবাহিত ছিলেন বলেও জানা যায়। আর এরা সবাই ছিলেন হযরত ইবরাহীমেরই বংশধর। বস্তুত মহানবী (সা)-ও যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর, তখন তিনিও যদি এ সমস্ত নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে)। যা হোক (হযরত ইবরাহীমের বংশধর নবী-রসূলদের যুগে যারা উপস্থিত ছিল) তাদের কেউ কেউ তো এই কিতাব ও হিকমতের উপর ঈমান এনেছিল। আবার অনেক এমনও ছিল,

যারা তা থেকে বহু দূরে নিপতিত রয়ে গিয়েছিল। (সুতরাং আপনার রিসালত ও কিতাবের উপরও যদি আপনার আমলে কোন কোন লোক ঈমান না আনে, তাহলে তা কোন দুঃখ করার বিষয় নয়।) আর (এই কাফির ও বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের উপর যদি এ পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণ শাস্তি আরোপিত হয় অথবা নাও হয়, তবে তাতে কি আসে যায়, তাদের জন্য যে আখিরাতে) দোযখের শিখায়িত আগুন (---এর শাস্তিই) যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা)-কে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরতো। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য ৫৩ ও ৫৪তম আয়াতে তাদের সে হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দুটির মর্ম মূলত একই। তা হলো এই যে, আল্লাহ্ বলেছেন যে, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-এর কারণটা কি ? যদি তা এ কারণে হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ, এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না হয় আমরা নাই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে কেন যাবে---রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক! তাহলে তার উত্তর হল এই যে, তিনিও নবীদেরই বংশধর, যাদের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

ঈর্ষার সংজ্ঞা, তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ ঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নদভী (র) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

الحسد تمنى زوال النعمة

অর্থাৎ "অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামতের অপসরণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা।" আর এটি হারাম।

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ٥

অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না বরং আল্লাহ্র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।---(মুসলিম, ২য় খণ্ড)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

"তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।"---(আবূ দাউদ)

عن الزبير رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبّ اليكم داءُ الامم قبلكم الحسد والبغضاء هى الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين -

"হযরত যুবায়র (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন---তোমাদের দিকেও পূর্ববর্তী উম্মতদের ব্যাধি চুপিসারে ধেয়ে আসছে। আর তা হল হিংসা ও বিদ্বেষ। এটা এমন এক অভ্যাস, যা মুড়ে দেয়। আমি চুল মুড়ে দেওয়ার কথা বলছি না বরং দীনকে মুড়ে দেয়।"---(তিরমিযী)

ঈর্ষা বা হাসাদ পার্থিব পরাকাষ্ঠার জন্য হোক অথবা ধর্মীয় পরাকাষ্ঠার জন্য হোক, হারাম। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ এর দ্বারা প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রতি এবং الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ—এর দ্বারা দ্বিতীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বোঝায়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

(৫৬) এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যে সব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, হিকমতের অধিকারী। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করব তাদেরকে জান্নাতে,

যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব ঘন ছায়ানীড়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আমার আয়াত (ও আহকাম) সমূহকে অস্বীকার করবে, (আমি) যথাশীঘ্র (তাদেরকে) কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করব। (সেখানে তাদের অবস্থা এমন থাকবে যে,) যখন একবার তাদের শরীরের চামড়া (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন (পুনর্বার) আমি সে চামড়ার জায়গায় তৎক্ষণাৎ (নতুন) চামড়া তৈরী করে দেব, যাতে (তারা অনন্তকাল) আযাবই ভুগতে থাকে। (কারণ, প্রথম চামড়া জ্বলে যাবার পর সন্দেহ হতে পারত যে, হয়তো তাতে আর কোন অনুভূতিই থাকবে না, কাজেই এই সন্দেহও অপনোদন করে দেওয়া হয়েছে।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরাক্রমশালী (তিনি এসব শাস্তি দিতে সক্ষম এবং) হিকমতের অধিকারী। (কাজেই জ্বলে যাওয়া চামড়ার মধ্যে কষ্টের অনুভূতি বজায় রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ হিকমত বা তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে চামড়া পাল্টিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন।) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম (সম্পাদন) করেছে, আমি শীঘ্রই তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাব যে, সেগুলোর (মাঝে নির্মিত প্রাসাদসমূহের) তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা সেগুলোতে বাস করবে অনন্তকাল। তাদের জন্য এ জান্নাতসমূহে পূত-পবিত্র পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ থাকবে এবং আমি তাদেরকে অতি ঘন ছায়াপূর্ণ (স্থানে) প্রবেশ করাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كلما نضجت جلودهم بدلنهم —আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত মু'আয (রা) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেওয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

تاكل النار كل يوم سبعين الف مرة كلما اكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا -

"আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে।---(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان اهون اهل النار عذابا رجل فى اخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل بالقمقم -

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচাইতে কম আযাব হবে সে লোকের যার পায়ের তালুতে দু'টি আগুনের অঙ্গার থাকবে, যার ফলে তার মগজ (চুলার উপর চাপানো) হাঁড়ির মত উথলাতে থাকবে।---(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯)

পূত-পবিত্রা স্ত্রী ঃ হাকিম আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের রমণীরা হবে পবিত্র পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ তারা প্রস্রাব, পায়খানা, ঋতুস্রাব এবং নাক-মুখ দিয়ে প্রবাহিত হয়—এমন যাবতীয় জঞ্জাল থেকে মুক্ত হবে।

হযরত মুজাহিদ উল্লিখিত বিষয়গুলোর চাইতে আরো কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন যে, তারা সন্তান প্রসব ও বীর্যস্খলন থেকেও পবিত্র হবে।---(মাযহারী)

ظِلٌّ—ظِلًّا ظَلِيْلًا শব্দের পর ظَلِيْلٌ শব্দ প্রয়োগে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে ছায়ানীড় তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে, তা হবে স্থায়ী এবং অত্যন্ত ঘন। যেমন, আরবীতে বলা হয়—لَيْلٌ لَئِيْلٌ এবং شَمْسٌ شَامِسٌ -এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী।

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام مايقطعها اقرءوا ان شئتم وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ -

---হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়া কোন অশ্বারোহী একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ আয়াতটি পাঠ করতে পার।---(মাযহারী)

হযরত রা'বী ইবনে আনাস ظِلًّا ظَلِيْلًا—এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সে ছায়াটি হচ্ছে আরশের ছায়া, যা কখনো শেষ হবার নয়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

(৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের বলেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শাসন ক্ষমতার অধিকারীবৃন্দ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের) এ বিষয়ে নির্দেশ দান করেছেন যে, (তোমাদের দায়িত্বে) হকদারদের যেসব হক রয়েছে, তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দাও। আর (তোমাদের) এ নির্দেশও দিচ্ছেন যে, তোমরা যখন (আওতাভুক্ত) লোকদের (কোন বিষয়ের) মীমাংসা করবে (এমন কোন অধিকারের ব্যাপারে, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিতর্কিত), তখন মীমাংসা করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের যে বিষয়ে উপদেশ দান করেন তা (পার্থিব দিক দিয়েও) যথার্থই উত্তম। (এতে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা আর পারলৌকিক দিক দিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও পুণ্য লাভের কারণ।) এতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের কথাবার্তা যা তোমরা মীমাংসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বলে থাক) ভালভাবেই শোনেন (আর তোমাদের কার্যকলাপ, যা এ ব্যাপারে তোমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়) ভালভাবেই দেখেন। (অতএব, তোমরা যদি কোন কারণে হেরফের কর, তবে তিনি তা জেনে নিয়ে তোমাদের তদনুসারে শাস্তিদান করবেন। এই তো গেল শাসকদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ। পরবর্তীতে যারা আজ্ঞাবহ তাদের প্রতি বলা হচ্ছে—) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র কথা মান্য কর এবং রসূল (সা)-এর কথা মান্য কর। (এ নির্দেশটি হলো শাসক-শাসিত সবার জন্য ব্যাপক।) আর তোমাদের মধ্যে যারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদের কথাও (মান্য কর।) (এ নির্দেশটি হল বিশেষভাবে শাসনাধীন লোকদের জন্য।) অতঃপর (তাদের নির্দেশ যদি শাসক-শাসিতের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুমের বিরোধী না হয়, তবে তো ভাল; তাদের কথা মান্য করবে, কিন্তু) যদি (তাদের নির্দেশের মধ্যে)